সুখের লোহাগিয়া

প্রণব রায়

পরম স্নেহের

গীতাঞ্জলি দেবী

ও

ভূপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

এই লেখকের লেখা :

একটুকু ছোঁওয়া লাগে
সেদিন ছ'জনে
বহুরূপী
নীল রুমাল

সুখের লাগিয়া

ফ্রী স্কুল স্ট্রীট এসে যেখানে পার্ক স্ট্রীটে মিশেছে, ঘটনাটা ঘটল সেইখানেই।

চৌরঙ্গীর মোড়ে গোল্ড ফ্লেকের ঘড়িতে তখন দুটো কাঁটাই বারোটার ঘরে। শীতের রাত। শহরের এদিকটা ফাঁকা বলে ধোঁয়ার উৎপাত নেই। শুধু হিমে ভেজা কুয়াশায় পার্ক স্ট্রীটের ছবিটা ঝাপসা ফটোগ্রাফের মত অস্পষ্ট। লোক নেই পথে। থাকবার কথাও নয়, হোটেল-'বার' আজকাল বন্ধ হয় দশটায়। জনহীন রাস্তায় শুধু ফিরিঙ্গী পাড়ার এক-আধটা মুসলমান দালাল পথভোলা মাতাল শিকারের জন্যে ওৎ পেতে জেগে আছে। আর জেগে আছে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি একটা গাড়ি-বারান্দার থামে হেলান দিয়ে কালো ওভারকোট ঢাকা বীটের পুলিশ। জেগে আছে বলাটা অবশ্য ঠিক হবে না, গাড়ি-বারান্দার থামে ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছে।

ঘটনাটা ঘটল ঠিক তখনই। চৌরঙ্গীর মোড়ে গোল্ড ফ্লেকের ঘড়িতে কাঁটা দুটো যখন বারোটার ঘরে। চমকে উঠে বীটের পুলিশ তাকাল। না, ভুল শোনে নি সে। পার্ক স্ট্রীটের নিশুতি নির্জনতা চিরে দিয়ে একটা মেয়ে-গলার চিৎকার উঠেই থেমে গেল হঠাৎ। অমানুষিক ভয় আর যন্ত্রণার আওয়াজ। কিন্তু থেমে গেল কেন? চমকে উঠে তাকাল বীটের পুলিশ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখ তুললো ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে চারতলা ম্যানসনটার দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে চারতলার একটা খোলা জানলা-পথে টুক করে আলো নিভে গেল।

হুইস্‌ল্ বের করে বীটের পুলিশ তাতে ফুঁ দিলে। চৌরঙ্গীর মোড থেকে তার জবাব শোনা গেল। আর, শোনা গেল পিচের রাস্তায় আর একজোড়া ভারি বুটের আওয়াজ। জুড়িদার কনস্টেবল ছুটে আসছে।

ফট্ ফট্ করে' খুলে গেল আশপাশের বাড়ির জানালা দরজাগুলো। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠল বাতি। আর খোলা জানলা-দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল ত্রস্ত উদ্বিগ্ন কতকগুলো মুখ।

সুখের লাগিয়া

কি, কি হয়েছে ? কি হলো ?

কার চিৎকার ?

পুলিশের বাঁশি বাজে কেন ?

কি হয়েছে সেপাই ?

খোলা দরজা-জানলাপথে মুখগুলো পরস্পরকে টুকরো টুকরো প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে। কৌতূহল সামলাতে না পেরে কেউ কেউ শীতের রাতের আরামকে অগ্রাহ্য করে নেমে আসে ফুটপাথের ওপর। জনতার সোরগোল ওঠে রাস্তায়। চৌরঙ্গী থেকে জুড়িদার পুলিশ ততক্ষণে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের মোড়ে এসে পড়েছে। ম্যানসন বাড়িটা লক্ষ্য করে দুই পুলিশ ছুটল। পেছনে জনতা।

ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের উল্টো দিকের ফুটপাথ ঘেঁসে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়েছিল কালো রঙের একখানা ট্যাক্সি। সামনের সীটে গুটিসুটি মেরে আরামে ঘুম দিচ্ছিল ড্রাইভার। পুলিশের বাঁশি আর জনতার সোরগোলে সেও জেগে উঠল ধড়মড করে'। ষ্টার্ট দিয়ে বসল ইঞ্জিনে। কে জানে কি হয়েছে ! ঝামেলার জায়গা থেকে সরে পড়াই ভাল।

কিন্তু ইঞ্জিনে ষ্টার্ট দিয়েও সে যায় না কেন ? দু'চোখে সজাগ দৃষ্টি নিয়ে কেন তাকিয়ে থাকে ম্যানসন-বাড়িটার দিকে ?

ম্যানসনের চারতলায় দুটো ফ্ল্যাট। সিঁড়ির বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের একটা ঘরে যমুনা লালা তখন তাড়াতাড়ি গরম কোটটা গায়ে চাপাচ্ছে। আওয়াজটা সেও শুনেছে। অমানুষিক ভয় আর যন্ত্রণার চিৎকার। সিঁড়ির ডান দিক থেকে, শোভা ইম্যানুয়েলের ঘর থেকেই আওয়াজটা আসছে মনে হল। আধো ঘুমন্ত আধো জাগা চেতনার মাঝে চিৎকারটা শুনে যমুনা কিছুক্ষণ কাঠ হয়ে পড়েছিল বিছানায়। তারপর স্প্রীংয়ের মত লাফিয়ে উঠে কাঁপা হাতে গরম কোটটা গায়ে চাপিয়ে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল সে। কি হল শোভা ইম্যানুয়েলের ? মাঝরাতে এমন চিৎকার করে উঠে হঠাৎ থেমেই বা গেল কেন ?

বারান্দায় বেরিয়ে এক সেকেণ্ডের জন্যে থতিয়ে গেল যমুনা। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। খুট করে টিপে দিলে সিঁড়ির বাতির সুইচ। তারপর

দ্রুত পায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল যমুনা। জুতোর আওয়াজটা ততক্ষণে চারতলা আর তিনতলার মাঝামাঝি নেমে গেছে। সিঁড়ির মাথা থেকে মুখ বাড়িয়ে যমুনা শুধু দেখতে পেলে সবুজ চেক টুইডের কোট পরা চওড়া পিঠ আর উড়ন্ত লাল টাই। মুখ নিচু করে লোকটা দ্রুতবেগে নিচে নেমে যাচ্ছে। দোতলা পর্যন্ত দেখা গেল লোকটাকে। সবুজ টুইডের কোট আর উড়ন্ত লাল টাই। তারপর একতলার অন্ধকারে চকিতে মিলিয়ে গেল লোকটা।

ওপরে দাঁড়িয়ে যমুনা যখন কি করবে ভাবছে, লোকটা তখন একতলায় নেমে এসেছে। মাত্র দশ গজ দূরে সদর-দরজা। হুড়মুড় করে খুলে গেল। ঢুকে এল দুজন কনস্টেবল, তার পেছনে কৌতূহলী জনতা। অন্ধকারে ছায়ার মত সরে গেল লোকটা সিঁড়ির তলায়। তারই মাথার ওপর দিয়ে অনেকগুলো ব্যস্ত পায়ের শব্দ ক্রমশ উঠে গেল ওপরে।

আস্তে আস্তে মুখ বাড়াল লোকটা। তারপর খোলা সদরপথে সাঁ করে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। সেই চওড়া পিঠ, সবুজ চেক টুইডের কোট আর লাল টাই। ফাঁকা রাস্তা। কালো রঙের ট্যাক্সিখানা ও-ফুটপাথে তখনও দাঁড়িয়ে। মৃদু হৃদ্‌কম্পনের মত ধকধক শব্দে ইঞ্জিন চলছে তখনও।

পেছনের দরজা খুলে উঠে বসল সবুজ টুইডের কোট, লাল টাই। আওয়াজ হল গীয়ার টানার। ঝাপসা ফটোগ্রাফের মত কুয়াশায় অস্পষ্ট পার্ক স্ট্রীটের বুকে আরও অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল কালো রঙের ট্যাক্সি।

* * *

অনেকগুলো ব্যস্ত পায়ের শব্দ উঠে এল ওপরে, চারতলায়। সিঁড়ির মাথায় যমুনা তখনও দাঁড়িয়ে। রুদ্ধশ্বাসে বললে, ওই দিকে। বলে, ডান দিকে আঙুল দেখালে: শিগগির চলুন।

যমুনা নিজেই এগোল। সিঁড়ির ওপাশেও দু-কামরার আর একটা ফ্ল্যাট। প্রথম ঘরখানা বাদ দিয়ে দ্বিতীয় ঘরখানার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল যমুনা। ঘরখানা একেবারে রাস্তার ওপরে। শোভা ইম্যানুয়েলের

সুখের লাগিয়া

শোবার ঘরও বটে, ড্রয়িংরুমও বটে। অন্ধকার। দরজার কপাট দুটো হাটখোলা। ঘরের মধ্যে সমমাত্রিক ছন্দে একটা চাপা আওয়াজ ক্রমাগত উঠছে—ঘস্—ঘস—ঘস্—

ওই অন্ধকারের ভেতর গুহাবাসী শ্বাপদের মত কি ভয়ঙ্কর রহস্য অপেক্ষা করছে কে জানে! ঘস্ ঘস্ চাপা আওয়াজটা কি তারই থাবা আস্ফালন?

মুখ ফিরিয়ে যমুনা একবার তাকাল কনস্টেবলদের মুখের দিকে। তারপর খানিক সাহস সঞ্চয় করে ঢুকে গেল তারা ঘরে। স্তম্ভিত জনতা দাঁড়িয়ে রইল দোরগোড়ায়। দরজার পাশেই সুইচ বোর্ড। আন্দাজে হাত বাড়ালে যমুনা। জ্বলে উঠল জোরালো বাতি। আর সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ শিসের মত একটা চিৎকার দিয়ে বুড়ো হ্যারি সাহেবের গায়ের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল যমুনা।

খাটের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে একটি মেয়ের দেহ। মাথাটা ঝুলে পড়েছে খাটের বাইরে। হা-করা মুখের কষ বেয়ে সরু একটু রক্তের ধারা। খোলা চোখে আতঙ্ক আর বিভীষিকা। মেয়েটির বয়েস পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। শরীরের বাঁকাচোরা রেখায় রেখায় বন্য যৌবনের প্রকাশ।

কিন্তু ঘস্ ঘস্ আওয়াজটা সত্যিই কোন গুহাবাসী শ্বাপদের নয়।

ঘরের কোণে একটা গ্রামোফোন মেশিন থেকে তখনও সেই আওয়াজটা উঠছে। বিলিতি অর্কেস্ট্রার একখানা রেকর্ড চাপানো হয়েছিল। বাজনা ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু মেশিনের দম ফুরোয় নি তখনও। সাউণ্ড বক্সের নিডলটা লেবেলের কাছে সরে এসে একঘেয়ে একটানা আওয়াজ তুলছে।

খবর গেল পার্ক স্ট্রীট থানায়। আধ ঘণ্টার ভেতরেই এল পুলিশ অফিসার। দেখা গেল মেয়েটির গলা ঘিরে সরু কালশিরে দাগ। আর, পাওয়া গেল একটা সোফার পায়ের কাছে গোল্ড ফ্লেকের খালি প্যাকেট আর গোল করে ফাঁস বাঁধা তার সোনালি রিবনটা।

মেয়েটি কে? পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করলেন।

দোতলার বাসিন্দা বুড়ো হ্যারি সাহেব বললেন, শোভা ইম্যানুয়েল।

পেশা?

নাচওয়ালী। শোভা ইম্যান্নুয়েল কি—

ঠাণ্ডা গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, হ্যাঁ, মারা গেছেন।

গ্রামোফোন মেশিন থেকে ঘস্ ঘস্ আওয়াজটা আর শোনা যাচ্ছে না। দম ফুরিয়ে গেছে মেশিনটার।

পরস্পরেব মুখ চাওয়াচায়ি করল প্রতিবেশী জনতা। বুড়ো হ্যারি সাহেবের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল যমুনা। মাবা গেছে, শোভা ইম্যান্নয়েল মাবা গেছে। খুন হয়েছে সে। এ ধরনের মেয়েদের শেষ অবধি যা হয়।

ইন্সপেক্টর এগিয়ে এলেন জনতাব সামনে: এ ঘবে কাউকে দেখেছেন আপনাবা? আসতে বা বেরিয়ে যেতে?

নিজেকে তখন অনেকটা সামলেছে যমুনা। মুখ তুলে বললে, আমি দেখেছি।

আপনি কে?

যমুনা লালা। বাঁ দিকের ফ্ল্যাটেব বাসিন্দা।

পেশা?

ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কের স্টেনো।

কি দেখেছেন?

চারতলা থেকে একজনকে নেমে যেতে দেখছি।

কখন?

আধঘণ্টা আগে। গরম কোটের আস্তিন দিয়ে চোখের জলটা মুছে নিলে যমুনা। তারপর বললে, শোভার ঘর থেকে একটা চিৎকার শুনে আচমকা আমার তন্দ্রা ভেঙে যায়। গরম কোটটা গায়ে চাপিয়ে তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে পড়ি। শোভার ঘরের দিকে এগোতে গিয়ে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাই। আলো জ্বেলে দেখলাম একটা লোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে।

চেনা লোক?

না, আমার চেনা নয়। যদিও শোভার অনেক বন্ধুকেই আমি দেখেছি।

চোহারা কেমন ?

তাও বলতে পাবি না। মুখখানা দেখতেই পাই নি। পেছন ফিরে দ্রুত পায়ে নেমে যাচ্ছিল সে। চোখে পড়ল শুধু একখানা চওড়া পিঠ, সবুজ চেক টুইডের কোট আর উড়ন্ত লাল টাই....দরজাটা ভেজিয়ে দেবেন ইন্সপেক্টব ?

দরজার কপাট দুটো টেনে দিল ইন্সপেক্টব। চোখের আড়াল হয়ে গেল শোভা ইম্যান্বয়েলের মৃতদেহ।

গোল্ড ফ্লেকেব ঘড়িতে তখন রাত দেড়টা।

ঠিক বাত দেড়টায় একখানা ট্যাক্সি ঢুকল টালিগঞ্জের রূপালি স্টুডিয়োর ফটকের মধ্যে। থামল এসে-দুনম্বর স্টেজের সামনে। ভাল করে থামবার আগেই দরজা খুলে নেমে পড়ল প্যাসেঞ্জার। গায়ে সবুজরঙ টুইডের কোট আর লাল টাই।

ক্যাপস্টানের টিন হাতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল এক ছোকরা।

কি ব্যাপার কুন্তলদা ? এত দেরি যে ?

ট্যাক্সিব ভাড়া মিটিয়ে দিতে দিতে লোকটি জবাব দেয়, হয়ে গেল একটু দেরি। সাউণ্ড রেডি ?

রেডি। ক্যাপস্টানের টিন খুলে লোকটার সামনে ধরল ছোকরাটি। একটা তুলে নিয়ে লোকটি বললে, দু প্যাকেট গোল্ড ফ্লেক আনিয়ে দাও বিপিন।

ফ্লোরের মধ্যে ঢুকে গেল লোকটি। বাইরে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিল সাউণ্ড ভ্যান। ব্যবস্থাপক বিপিন হন্তদন্ত হয়ে সেখানে গিয়ে দেখে রেকর্ডিস্ট আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আরামে নিদ্রামগ্ন।

উঠুন সত্যেনদা, কুন্তলদা এসে গেছেন। উঠুন।

সুখের লাগিয়া

আড়ামোড়া ভেঙে রেকর্ডিস্ট প্রশ্ন করেন, কে এসেছেন ?

কুন্তল চ্যাটার্জি। মিউজিক ডাইরেক্টর।

রেকর্ডিস্ট সত্যেনের মুখে বিরক্তি দেখা দিল : এসেছেন ? রাতটা কাবার করে এলেই তো পারতেন !

তাই বটে। রাত কাবার হতে ক' ঘণ্টাই বা কি ? কুন্তল চ্যাটার্জি আজ ভীষণ লেট করে ফেলেছে। অথচ লেট তার কখনও হয় না। ঠিক সময়ের আগে পৌছানোই তার অভ্যাস। রাত এগারোটায় ছিল আজকের প্রোগ্রাম। কে জানত দু'ঘণ্টারও বেশি দেরি হয়ে যাবে।

ফ্লোরের মধ্যে ঢুকল কুন্তল চ্যাটার্জি। ঝলমল আলোয় ভেতরটা দিন হয়ে গেছে। মাইক্রোফোনের সামনে অর্ধ চন্দ্রাকারে বাজিয়ের দল বসে আছে। একধারে এই শীতের রাতেও সঙ্গীত পরিচালক কুন্তল চ্যাটার্জির অনুরাগিনী আর অনুরাগীদের ভিড। অনেক স্যুট আর শাড়ির রঙের ছটায়, অনেক অলঙ্কারের ঘটায় আর প্রসাধনের চটকে সে জায়গাটা মরশুমী ফুলের প্রকাণ্ড একটা স্তবকের মত দেখাচ্ছে।

মৌচাকের মত সারা ফ্লোরটা গুঞ্জরিত হচ্ছিল। কুন্তল ঢুকতেই চুপচাপ। নড়েচড়ে বসল বাজিয়েরা। মাইক্রোফোনের ওপাশে অল্প উঁচু একটা প্ল্যাটফর্ম। দৃঢ় পা ফেলে ফেলে কুন্তল সোজা এসে দাঁড়াল তার ওপর। কে একটু হাসল, কে বিনীত অভিবাদন জানাল, অন্তরঙ্গতার ভঙ্গিতে কে একটু এগিয়ে এল, আজ আর লক্ষ্য করল না। আজ সে কেমন যেন অন্যমনস্ক। হয়তো বা ডুবে আছে নিজের মধ্যে। নিজের কম্পোজিসনে, নিজের সুর-বিন্যাসের মাদকতায় বিভোর হয়ে আছে মনে মনে। তাই বোধ করি খেয়াল নেই কোন দিকে।

অল্প উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াল কুন্তল। বাজিয়েদের মুখোমুখি। আশপাশের আলোগুলো এক এক করে নিভে এল। জ্বালা রইল শুধু দু'পাশে এক কিলো ওয়াটের দুটো ল্যাম্প। বাজিয়েরা যাতে নিজের নিজের নোটেশন খাতা দেখতে পায়। আর রইল কুন্তলের ওপর পাঁচশ পাওয়ারের একটা বাতি। অনেকটা থিয়েটারের স্টেজের ওপর আলোর ফোকাশের মতন।

সুখের লাগিয়া

নাটকের কোন চরিত্রের মতই দেখাচ্ছে কুন্তলকে। দীর্ঘ সরল দেহ। নামকরা দর্জির তৈরী কোটের গুণে কাঁধ দুটোকে দেখাচ্ছে পুষ্ট আর চওড়া। রঙ ফর্সা নয় কুন্তলের, তবে মাজাঘষার দরুণ কালো বলাও চলে না। তীক্ষ্ণ নাক আর চাপা ঠোঁটে এমন একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ যা পথে-ঘাটে সচরাচর নজরে পড়ে না। চোখ দুটো একটু ছোটই বলতে হবে, কিন্তু মিশমিশে কালো আর উজ্জ্বল। বুদ্ধির দীপ্তি মাখানো। কুন্তলকে যারা প্রায়ই দেখে তারা জানে, সর্বদাই সে টিপটপ থাকে। আজ কিন্তু মুখের অন্যমনস্কভাবে, লালরঙের টাই-এর শিথিল ফাঁসে আর তার মাথার পিছনে ঠেলে দেওয়া এলোমেলো চুলে কেমন একটা ঝড়ো-ঝড়ো ভাব।

আধপোড়া সিগারেটটা প্ল্যাটফর্মের ওপর ফেলে দিয়ে জুতোর আগা দিয়ে পিষে ফেলল কুন্তল। তারপর স্বভাব-গম্ভীরস্বরে হাঁকলে, রেডি এভরিবডি ?

যন্ত্রীদের কাছ থেকে জবাব এল, ইয়েস স্যার।

মনিটর !

বাইরে সাউণ্ড ট্রাকে ফেডারে হাত রেখে সত্যেনবাবু ধড়মড় করে বলে উঠলেন, ইয়েস ! সঙ্গে সঙ্গে য়্যামপ্লিফায়ার থেকে শোনা গেল সুন্দর একটা অর্কেস্ট্রা। সত্যেনবাবুর রোগাটে মুখে বিরক্তির চিহ্নটুকু মুছে যেতে লাগল। হাসি-হাসি মুখে তাঁর য়্যাসিসটাণ্টকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, দেরি করে এলে কি হবে, কুন্তল চ্যাটার্জি মিউজিক যা কম্পোজ করেছে— জবাব নেই।

ফ্লোরের ভেতরে সেই অল্প উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে দুই বাহু আন্দোলিত করে কুন্তল তখন মিউজিক কন্‌ডাক্ট করছে। চারপাশের আবছা অন্ধকারের মধ্যে পাঁচশ পাওয়ার ল্যাম্পের একঝলক আলোয় জ্বল্‌জ্বল্ করছে সবুজ রঙের চেক টুইডের একটা কোট আর লাল টাই।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল কুন্তলের।

অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেলা বলতে হবে বৈকি ! সাধারণতঃ সে ঘুম থেকে ওঠে ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে। আজ ঘড়ির কাঁটা নটার ঘর পার হয়ে গেছে। দোষ নেই কুন্তলের। গতকাল স্টুডিয়ো থেকে রেকর্ডিং

সেরে ফিরতে ভোরই হয়ে গিয়েছিল। একটা ছবির সাত হাজার ফিট ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক। নেহাৎ কুন্তল চ্যাটার্জি বলেই চার ঘণ্টায় সাত হাজার ফিট মিউজিক দিতে পেরেছে।

তোয়ালে হাতে কুন্তল বাথরুম থেকে বেরিয়ে যখন এল, দুধের ফেনার মত সাদা রোদে বারান্দা ভরে গেছে। রোদ উজ্জ্বল অথচ নরম। সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই হাতে নিয়ে কুন্তল বারান্দায় বেরিয়ে এসে একটা বেতের চেয়ার দখল করলে, তারপর সিগারেট ধরালে একটা। এটা কুন্তলের সাম্প্রতিক অভ্যাস। কিন্তু ভাল করে একটা টান দেবার আগেই সিগারেটটার যেন পাখা গজালো হঠাৎ। এক নিমিষে উধাও হয়ে গেল মুখ থেকে।

কুন্তল মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখে মিতালী। তার ডান হাতে চা, বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। কুন্তল হাসিমুখে বলল, হাতের কাছে ক্যামেরা থাকলে তোমার একটা স্ন্যাপ নিয়ে নিতাম। গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের খুব চমৎকার একটা বিজ্ঞাপন হতো। 'সঙ্গীত পরিচালক কুন্তল চ্যাটার্জির স্ত্রী শ্রীমতী মিতালী দেবী গোল্ড ফ্লেকই পান করেন।'

অল্প হাসিতে মিতালীর পাতলা ঠোঁট দুটো কুঁড়ির দুটি পাঁপড়ির মত খুলে গেল। বললে, আমি তো সিনেমার হিরোইন নই যে আমার নামে বিজ্ঞাপন বেরোবে। তারপরই ভুরু দুটো জোড়া ধনুকের মত করে বললে, ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই মুখে সিগারেট। ভয়ানক বাড়াবাড়ি শুরু করেছ তুমি!

জ্বলন্ত সিগারেটটা মিতালী য়্যাসট্রের মধ্যে গুঁজে দিল।

দু চোখে একটি ইঙ্গিত নিয়ে গম্ভীর মুখে কুন্তল জবাব দিল, মুখে দেবার মত আর কিছু তো হাতের কাছে পাই না, অগত্যা সিগারেটই মুখে দিই।

তেমনি ভুরু কুটিল করে মিতালী বলে উঠল, মিথ্যুক! বদনাম দেওয়া পুরুষের স্বভাব। তারপর বেতের টেবিলটার ওপর চায়ের পেয়ালা রাখতে রাখতে বললে, সত্যিই, গত কয়েক মাস ধরে সিগারেট খাওয়া তুমি ভীষণ রকম বাড়িয়েছো কিন্তু।

চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে কুন্তল সহজভাবে বললে, এক সঙ্গে অনেকগুলো ছবির কাজ পড়েছে কিনা, তাই নেশাটাও বেড়েছে। আবার কমিয়ে দেবো, ভেবো না। হ্যাঁ, আমার কোটের ভেতর পকেটে

একখানা খাম আছে। বাণী চিত্রমের বাকি আড়াই হাজার টাকা। বের করে নাওগে।

মিতালী বললে, বের করে আর কি হবে। তুমি বরং দীপুর নামে ওই আড়াই হাজার টাকার সেভিং সার্টিফিকেট কিনে রাখো।

বেশ, তাই হবে। আমি তাহলে স্নানটা সেরে বেরিয়ে পড়ি।

চায়ের পেয়ালাটা শেষ করে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে কুন্তল বাথরুমে ঢুকল। ঢোকবার আগে নতুন সিগারেটটা স্ত্রীকে দেখিয়ে বলে গেল, রাগ করো, এটা নেশা নয়, পারগেটিভ।

পুরো চল্লিশ মিনিট বাদে বাথরুম থেকে বেরোল কুন্তল, একেবারে দাড়ি কামানো, স্নান সেরে। বারান্দায় বেতের টেবিলে দুজনের মত ব্রেকফাষ্ট সাজানো। সেদিকে তাকিয়ে কুন্তল বললে, একি! তুমিও এখন খাওনি?

রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে মিতালী তরলস্বরে বললে, আজ্ঞে না। মশাই খেতে না বসলে—

দু-মিনিটে আসছি। বলে কুন্তল ঘরে ঢুকে গেল।

ঠিক দু-মিনিট না হলেও কুন্তল তাড়াতাড়িই ফিরে এল বারান্দায় ব্রেকফাস্টের টেবিলে। তার দিকে একঝলক তাকিয়ে মিতালী বলে উঠল, এ রাম! এটা আবার পরলে কেন? এই সবুজ টুইডের কোট ছাড়া কি আর কোন জামা নেই তোমার?

একটুকরো অমলেট মুখে ফেলে কুন্তল বললে, ঠিক আছে। এ বেলাটা এতেই কেটে যাবে। কদিন ধরে স্টুডিয়োর ধুলো খেয়েছে কোটটা। ও-বেলা কাচতে পাঠাব।

মিতালী বললে, ও-বেলা তুমি কিন্তু কোথাও বেরোতে পাবে না।

কেন বল দিকি? কোথায় যাবে? সিনেমা?

না।

দক্ষিণেশ্বর?

উঁহু।

তাহলে গীতাঞ্জলিদের বাড়ি নিশ্চয়ই?

তাও নয়।

কুন্তল একটু অবাক হয়ে বললে, তাও নয় ? তবে !

অত্যন্ত নিরীহের মত শান্ত গলায় মিতালী বললে, কোথাও যাব না তো !

হরি বল ! তবে আমাকে থাকতে বলছ কেন ?

তোমার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে, তাই থাকতে বলছি।

হেসে কুন্তল বললে, যথা আজ্ঞা দেবী।

কখন ফিরবে তুমি ?

একটার মধ্যেই আশা কবছি।

আসবার পথে একটা জিনিস আনবে কিন্তু।

কি ?

দুষ্টু-দুষ্টু মুখ করে মিতালী বললে, বল তো কি ?

ঘাড় নেড়ে কুন্তল বললে, আর ঠকতে রাজি নই। তুমি বল।

চোখ নামিয়ে মিতালী বললে, বিশেষ কিছু নয়, ডজন দুয়েক গোলাপ ফুল।

গোলাপ ফুল ? কেন, কি হবে ?

মুখ নিচু করে কফির পেয়ালায় মিতালী তখন চিনি গুলছে। জবাব দিল না—মুখে মিটি মিটি হাসি।

হঠাৎ কুন্তলেব চোখ-মুখ যেন রোদ লেগে ঝলমল কবে উঠল : আজকে সাতাশে মাঘ, না মিতা ?

মিতালী আস্তে আস্তে চোখ তুলল স্বামীর মুখেব দিকে। চোখের তারায় আর ঠোঁটের কোণায় মিটিমিটি হাসি নিয়ে ঘাড় নাড়ল শুধু।

সাতাশে মাঘ কুন্তল-মিতালীর বিয়ের তারিখ। মনে মনে হিসেব করলে কুন্তল, এই বছরেই সাত বছর পূর্ণ হবে তাদের বিবাহোৎসব। প্রতি বছর এই তারিখে তারা তিথি উদ্‌যাপন করে। এই উৎসব তাদের দুজনের, শুধু কুন্তল আর মিতালীর। এই দিনটিতে তাদের দুজনের পৃথিবীতে আর কারও নিমন্ত্রণ নেই। নানান কাজের ঝামেলায় কুন্তলের মনে ছিল না, কিন্তু মিতালী ঠিক মনে রাখে। সারা বছর ধরে একটি একটি করে দিন গোণে বোধ হয় সাতাশে মাঘের জন্যে। উৎসবে কোন বাহুল্য থাকে না। কুন্তলের প্রিয় দু-একটা রান্না আর মিতালীর প্রিয় একগোছা গোলাপ ফুল। এই নিয়েই

দুজনের উৎসব। আর তার সঙ্গে প্রথম বাসর রাত্রির কিছু পুরোন স্মৃতি কথা। সাতাশে মাঘ দুজনে অনেক রাত অবধি জেগে থাকে। তারপর পাশাপাশি এক বালিশে মাথা দিয়ে ফিস্ ফিস্ তন্দ্রাজড়ানো স্বরে কথা বলতে বলতে এক সময় কথা যায় হারিয়ে। সাতাশে মাঘের রাত ভোর হয়ে যায়। ভোর হয়ে যায় নতুন বছরেব আলোয়, যুগল-জীবনের সুখের মধ্যে।

সেই প্রথম বিয়ের রাত কুন্তলের মনে পড়ে বৈকি! একুশ বছরের মিতালীর কনে-চন্দন পরা সেই অপরূপ রূপসজ্জা। চোখে-মুখে সেই দুষ্টু হাসি আর লজ্জা। পরিচিত বরের কাছে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা, অথচ কাছে এসেই চোখ বুজে ফেলা। কুন্তলের সব মনে পড়ে। মনে পড়ে আর হাসে সেদিনকার মিতালীর কথা ভেবে। গোলাপ বরাবরই মিতালীর প্রিয় ফুল। প্রিয় হবার কারণও আছে। ফুলশয্যার দিনে মিতালীর মাসতুতো ভগ্নিপতি পাঠিয়েছিলেন একঝুড়ি গোলাপ। বাজার থেকে তাই কোন ফুল কিনতেই হয় নি। সেই এক ঝুড়ি গোলাপ দিয়ে সাজানো হয়েছিল যুগলশয্যা। রাতে শুতে এসে কুন্তল বলেছিল, তুমি কোথায় মিতা?

পাঁচ পাওয়ারের মৃদু নীল বাতিটা ঘরে জ্বলছিল। মিতালী একটু অবাক হয়ে বলেছিল, এই তো আমি, খাটের ওপরে। দেখতে পাচ্ছ না?

কুন্তল বলেছিল, ও, হ্যাঁ, তুমিই বটে! ঘরে ঢুকেই কি দেখলাম জানো? অনেক গোলাপেব মাঝখানে আর একটা মস্তবড় গোলাপ। ভাবলাম এও বুঝি মধুপুর থেকে এসেছে।

লজ্জায়-সুখে-আনন্দে মুখ রাঙা করে মিতালী বললে, এ গোলাপ শুধু তোমার বাগানেই ফুটেছে।

সেই থেকে মিতালীর প্রিয় ফুল হলো গোলাপ। বছরে শুধু একবার, একটা দিনই কুন্তলকে সে ফরমাস করে গোলাপ আনতে। সে তারিখটা হলো সাতাশে মাঘ।

পরিপূর্ণ চোখে তাকাল কুন্তল মিতালীর দিকে। শীতের রোদ পড়েছে মিতালীর কমলা রঙের শাড়ির ওপর। তারই আভায় চিক্‌চিক্ করছে মুখের বাঁ-দিকটা। আর বাঁ-চোখের বড় বড় পালকগুলি ছায়া ফেলেছে সুগৌর গালের ওপর। ধবধবে ছোট কপালে ছোট্ট একটি সিঁদুরের টীপ আর ফুরফুরে

কয়েকগাছি রুখ্‌খু চুল। বিয়ের পর সাত বছর কেটে গেছে। একুশ বছরের মিতালী আজ আটাশ বছরের বধূ! মা হয়েছে মিতালী, কোলে এসেছে দীপু। তবু তেমনিই আছে সে। না ভুল হোলো। মিতালী আর আগের মত নেই, আগের চেয়েও সুন্দর, আগের চেয়েও মধুর হয়েছে।

কিন্তু চোখ দিয়ে দেখেছে কুন্তল, মন দিয়ে দেখেনি। মনের ভেতরটা খুঁজে দেখলে ও বুঝতে পারত, আসলে সুন্দরতর হয়েছে মধুরতর হয়েছে মিতালীর প্রতি ওর ভালোবাসা।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে কুন্তল উঠে পড়তেই মিতালী বললে, কোটের পকেটে টাকার খামটা রইল, সাবধানে যেও কিন্তু। আর সকাল সকাল ফিরে এস।

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে কুন্তল বললে, তাই হবে। আমিও মনে করিয়ে দিয়ে যাই, বিকেলে আলতা পরো।

বারান্দার শেষে ফ্ল্যাটের প্রধান দরজা। কুন্তল সেদিকে এগোতেই ঘর থেকে ছুটে এল ছ' বছরের দীপু। এসে হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরল বাপের। কুন্তল নিচু হয়ে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললে, দাও।

বাপের গালে কচি কচি ঠোঁট দুখানা ঠেকিয়ে দীপু প্রশ্ন করলে, কোথায় যাচ্ছ বাবু

কুন্তল তার মাথার কোঁকড়া চুলগুলো আস্তে করে নেড়ে দিয়ে হালকা গলায় বললে, বড় হয়ে তুমি যাতে ইচ্ছেমত টাকা ওড়াতে পার, সেই ব্যবস্থাই করতে যাচ্ছি বাবা।

কুন্তল আর দাঁড়াল না, আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একবার ফিরে দেখলে, বারান্দার দরজার গোড়ায় দীপুর হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে মিতালী। অন্যদিন মিতালী একাই দাঁড়িয়ে থাকে। দীপু যায় কৃশ্চান স্কুলে বাসে চেপে। স্কুলের ছুটি বলে আজ দাঁড়িয়ে আছে মা ছেলেতে এক সঙ্গে। দেখতে ভারি সুন্দর লাগল কুন্তলের।

ছবিটা মনে মনে এঁকে নিয়ে সে নেমে গেল।

* * * *

কত টাকার কিনবেন?

আড়াই হাজার!

সুখের লাগিয়া

ন্যাশনাল প্ল্যানিং সেভিং সার্টিফিকেট ?

হ্যাঁ।

ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কের গুজরাটী ম্যানেজার শঙ্করলাল হাসি মুখে বললেন, আপনাদের ফিল্ম লাইনে শুনতে পাই অপচয় আছে, সঞ্চয় নেই। আপনাকে দেখে ধারণাটা বদলে গেছে মিস্টার চ্যাটার্জি।

হেসে কুন্তল বললে, কি জানেন শঙ্করলালজী, দশ বছরের বেশি কোন আর্টিস্টই ভালভাবে কাজ করতে পারে না। তাই আমার মত আরো অনেকেই দশ বছর পরের ভাবনাটা এখনই ভেবে রাখেন।

পেন্সিলটা হাতে নিয়ে শঙ্করলাল বললেন, সার্টিফিকেট কার নামে কেনা হবে ? আপনার ?

না, আমার ছেলে দীপেন চ্যাটার্জির নামে। যা জানবার আছে লিখে নিন।

খস্‌খস্‌ করে চলল শঙ্করলালের হাতের পেন্সিল। তারপর লেখা থামিয়ে ঘণ্টা টিপতেই এল চাপরাশি। স্লিপটা তার দিকে এগিয়ে বললেন, মিস লালা।

হাতঘড়িটা একবার দেখলেন শঙ্করলাল। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, একটু বসুন মিস্টার চ্যাটার্জি, আসছি। ততক্ষণে আমার স্টেনো ফর্ম ভর্তি করে দিক।

কতক্ষণ বসতে হবে ?—কুন্তল প্রশ্ন করল।

খুব বেশি হলে মিনিট দশেক।

আর একবার হেসে শঙ্করলাল বেরিয়ে গেলেন। ম্যানেজারের ঘরে একা বসে রইল কুন্তল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল আজ সকালের সেই ছবিটা সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে মিতালী। হাসিভরা চোখ দুটি বলছে, শিগগির করে ফিরো কিন্তু। আর তারই কোলের কাছে একমাথা ঝাঁকড়া চুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দীপু! আশ্চর্য! আজ সকালে এই ছবিটা দেখার পর থেকে সে মিতালীকে কিছুতেই আলাদা করে ভাবতে পারছে না। কোলের কাছে দীপু নইলে ছবিটা যেন কিছুতেই সম্পূর্ণ হয় না।

হাত আড়াল দিয়ে ছোট্ট একটা হাই তুললো কুন্তল। বেলা অবধি ঘুমোলেও রাত জাগার অবসাদটা এখনও যেন কাটেনি। চুপচাপ বসে থাকলেই সেই বিরক্তিকর অবসাদটা যেন চেপে ধরে। দশ মিনিট কি

সুখের লাগিয়া

হয় নি এখনও? দশ মিনিট হতে কি দশটা মিনিটেরও বেশি সময় লাগে? একটা সিগারেট খাওয়া যাক। পকেট থেকে বেরোল গোল্ড ফ্লেকের আনকোরা প্যাকেট। অভ্যাসের বশে সোনালি রিবনটা খুলে নিল কুন্তল। তারপর অভ্যস্ত আঙুলে রিং তৈরি করে যখন বাঁধছে, ঠিক সেই সময়েই খুট খুট করে হাই হিল জুতোর মৃদু আওয়াজ হল।

ঘাড় ঘুরিয়ে ফিরে তাকাল কুন্তল। সুইংডোর ঠেলে ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে স্কার্ট পরা একটি মেয়ে। সাধারণ দোহারা চেহারা। কাঁধ অবধি খাটো ফাঁপানো চুল, হাতের নখে লাল রঙ।* হাতে সার্টিফিকেটের ফর্ম। ব্যাঙ্কের কোন কর্মচারি। স্টেনোও হতে পারে।

প্রায় পনেরো সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি নিঃশব্দে। টকটকে লাল পুরু ঠোঁট দুখানা কিছু বলার জন্যে ফাঁক হয়েই রইল। চোখের তারা দুটো একবার ঝিলিক দিয়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল। পলক পর্য্যন্ত পড়ল না পনেরো সেকেণ্ড ধরে। জ্যান্ত মানুষ হঠাৎ পুতুল হয়ে গেলে যেমন হয়।

শঙ্করলালজীকে খুঁজছেন?

অস্বস্তিকর নীরবতা কুন্তলই ভাঙলে প্রশ্ন করে।

হঠাৎ আবার নড়ে উঠল স্কার্ট পরা পুতুলটা। চোখে পড়ল পলক। অত্যুগ্র লাল ঠোঁট দুখানা আরো একটু ফাঁক হয়ে প্রথমে ক্ষীণ আওয়াজ বেরোল 'হ্যাঁ' তারপরে 'না'!

সোনালি রিংটার মধ্যে তর্জনি ঢুকিয়ে ঘোরাচ্ছিল কুন্তল। আবার প্রশ্ন করলে, শঙ্করলালজী কখন ফিরবেন মনে হয়?

মেয়েটির কণ্ঠস্বরে কেমন যেন উৎসাহ প্রকাশ পেলো, শঙ্কর-লালজী? এখনই আসবেন—এই এলেন বলে—আপনি যাবেন না যেন, বসুন—

বলতে বলতে সুইংডোর ঠেলে অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটি। আর সেইদিকে তাকিয়ে কুন্তল ভাবতে লাগল, দু-একটা স্ক্রু' ঢিলে আছে নাকি মেয়েটির মাথায়? কথাগুলো কেমন যেন এলোমেলো।

সোনালি রিবনের রিঙটাকে দু আঙুলের টোকা দিয়ে কুন্তল ছুঁড়ে

দিলে মাথার ওপর ঘুরন্ত পাখাব দিকে। পাখাব ব্লেডে লেগে রিঙটা ফিরে এল শঙ্করলালের টেবিলের ওপর। একটা সিগারেট ধবিয়ে আবাম করে টানল কুন্তল। আরও কতক্ষণ বসতে হবে কে জানে! ব্যাঙ্কের দশ মিনিট যে দশটা মিনিটে হয় না, এটা তাব আগেই বোঝা উচিত ছিল। বেলা হলেও মিতালী আজ অন্তত কিছুতেই একা খাবে না। আশ্চর্য্য! সিঁড়ির মাথার সেই ছবিটা আবার মনে পড়ে গেল কুন্তলের। মিতালীর কোলের কাছে দীপু দাঁড়িয়ে। একখানা ঝাঁকড়া চুলের নিচে কচি পাতার মত টুলটুলে মুখখানি।

সহসা একটা সমস্যাব মধ্যে পড়ে গেল কুন্তল। কাকে সে বেশি ভালবাসে? মিতালী না দীপুকে? কখনও মনে হয়, তার মনেব সবটাই দখল কবে বসে আছে মিতালী, আবার কখনও মনে হয়, না, মিতালী তো নয়, দীপু। একটি মুখ ভাবতে গেলে আর একটি মুখ এসে আড়াল কবে দাঁড়ায়। দীপু আসার পর থেকে মিতালীব প্রতি তাব ভালোবাসা কি কমে গেছে? মনে মনে কুন্তল অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল। মিতালীকে কোনদিন কম ভালোবাসবে কুন্তল, এটা যেন একটা চোরা অপরাধ। অথচ নিজের ছেলেকে—বিশেষ করে দীপুর মত ছেলেকে না ভালোবেসেই বা উপায় কি। বড় কঠিন সমস্যায় পড়া গেল।

কিন্তু সিগারেটে টান দিতেই বুদ্ধি খুলে গেল। আরে দূব, দীপুকে ভালোবাসা মানেই তো মিতালীকে ভালোবাসা। দীপু আর মিতালী কি তফাৎ? দীপু তো মিতালীরই অংশ, সুতরাং তার ভালোবাসায় কম পড়েছে কোথায়।

অত্যন্ত সহজে অত্যন্ত কঠিন একটা সমস্যার সমাধান করে খুশি হয়ে উঠল কুন্তল। ধরালো আর একটা সিগারেট। আজকে কি কি জিনিস সওদা করতে হবে, মনে মনে একটা লিষ্ট করে ফেলল। মিতালীর জন্যে ডজন দুই গোলাপ ফুল। আর ঝাল দেওয়া কাজু বাদাম। দীপুর জন্যে 'ক্যাডবারী' চকোলেট। আর তার নিজের জন্যে ভাল একটিন সিগারেট। ওহো, তার নিজের জন্যে আরও একটা জিনিস বিশেষ দরকার। কিছু মিউজিক পেপার। গোয়ানীজ বাজিয়েদের জন্যে নতুন ছবির একটা গানের সুর ইংরাজিমতে লিখে দিতে হবে। আচ্ছা, কেমন দাঁড়াল নতুন গানটার সুর?

দু' হাত দিয়ে শঙ্করলালের টেবিলে মৃদু মৃদু তাল দিতে দিতে কুন্তল গুন্‌গুন্ করতে লাগল গানের মুখড়াটা। মন্দ কি, ভালই তো হয়েছে। কিন্তু অন্তরা? কোন্ পথে উঠবে?

পুড়তেই লাগল য়্যাশট্রেতে-রাখা গোটা সিগারেট। ডুবে গেল কুন্তলের মধ্যেকার শিল্পী সুরের নেশায়। বিচিত্র ছন্দে টোকা পড়তে লাগল শঙ্করলালের টেবিলে। আর দেয়ালের গায়ে ঘড়ির ডায়ালের বুকে মুহূর্তরা মরে যেতে লাগল এক-এক করে।

অন্তরাটা মনে মনে শেষ করে সঞ্চারীতে এসে পৌচেছে কুন্তল, এমন সময় তার পেছনে জুতোর আওয়াজ হল। একটি নয়, অনেকগুলি। ফিরে তাকিয়েই কুন্তল যেন পাথর হয়ে গেল। সুইংডোর ঠেলে স্কার্ট পরা মেয়েটি এবাব একা আসে নি। সঙ্গে এসেছে একজন পুলিশ অফিসার, দুজন সার্জেণ্ট। আর জনকয়েক কন্‌ষ্টেবল।

কুন্তলকে দেখিয়ে পুলিশ-অফিসার বললেন, এই লোক?

স্কার্ট পরা মেয়েটি ভয় আর ঘৃণা মেশানো দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কুন্তলেব দিকে। মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলে, হ্যাঁ, এই লোক—একেই দেখেছিলাম গত রাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে! এই সেই সবুজ-চেক কোট আর লাল টাই।

আপনার নাম?

যমুনা লালা, ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কের ষ্টেনো।

কুন্তলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে অফিসার বললেন, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে নর্তকী শোভা ইম্যানুয়েলকে হত্যা করার দায়ে আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম।

আশ্চর্য্য, একটিও জবাব দিলে না কুন্তল। শুধু চেয়ে রইল।

কুন্তলকে যখন কয়েদী-গাড়িতে তোলা হল, তখন বেলা প্রায় চারটে। ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্ক থেকে থানা, থানা থেকে পুলিশ হেড কোয়াটার্স, তারপর

সেখান থেকে ব্যাঙ্কশাল কোর্ট। পুলিশ তদন্তের সুবিধের জন্যে কুন্তলকে জামিন দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠল না। অতএব কোর্ট থেকে এখন চলেছে আলীপুর প্রেসিডেন্সী জেল।

শীতের ছোট দিন। এরই মধ্যে পড়ে আসছে। কালচে হয়ে আসছে শুকনো সূর্যমুখীর পাপড়ির মত। কয়েদী-গাড়ি এসে থামল প্রেসিডেন্সী জেলের ফটকেব সামনে। আরও ছ'জন কয়েদীদের সঙ্গে নামল কুন্তল। সহযাত্রী কয়েদীদের দুজন এসেছে চুরির দায়ে, দুজন দাঙ্গা আর ডাকাতির অভিযোগে। একজন নারীহরণ, আর একজন খুনের অপরাধে। এদের মধ্যে কুন্তল এতই বেমানান যে ফটকের বুলডগ-মুখো সার্জেণ্টটি পর্যন্ত কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তার দিকে। চার্জশীটের কাগজখানা আর একবার ভাল করে দেখল, লেখা রয়েছে ৩০২ আই পি সি। অর্থাৎ নিছক নরহত্যা। বুলডগ-মুখো সার্জেণ্ট নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল শুধু। তার মানে সার্জেণ্ট প্রকৃতই বিস্মিত হয়েছে।

কয়েদীদেব দেহ একে একে তল্লাসী করে ভেতরে চালান করে দেওয়া হল। এই পড়ন্ত বেলার আবছা অন্ধকারে মনে হল, প্রকাণ্ড জেলখানাটা একটা প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুর মত মুহূর্তের জন্যে হাঁ করেই একসঙ্গে সাতটা প্রাণীকে গ্রাস করে নিলে। ভেতরে যেতে যেতে কুন্তল শুনতে পেল লোহার গেট বন্ধ হওয়ার আওয়াজ। ক্ষণকালের জন্যে কুন্তলের সমস্ত শরীর হিম হয়ে এল। ওই লৌহ-কপাটের বাইরে পড়ে রইল আলো-হাসি-গানের জগৎ। সে চলে এল অন্ধ কারার গর্ভে। তার জীবনে ওই লৌহকপাট আর কোনদিন খুলবে কি? পেছন থেকে মৃদু ধাক্কার সঙ্গে একটা কথা কানে এল, চলেন বাবু।

কয়েদীদের লাইনে কুন্তল আবার এগোয়।

ডেপুটি-জেলারদের অফিস-ঘর পার হয়ে একটা বাঁধানো সড়ক। সেই সড়কের বাঁ দিকে 'চুয়াল্লিশ ডিগ্রী'। ইংরাজিতে যাকে বলে কনডেম্ড সেল। অর্থাৎ ফাঁসীর আসামীদের ঘর। সেগুলো ছাড়িয়ে সড়কটা ডান দিকে ঘুরে যেখানে গেছে, সেইখানেই 'বড় হাজত'। বড় হাজত মানে একদিকে ইটের দেয়াল, আর তিন দিকে মোটা মোটা লোহার শিক দিয়ে ঘেরা লম্বা-চওড়া

সুখের লাগিয়া

একটা খাঁচা—মানুষ-জন্তুদের পুরে রাখার জন্যে। সেই বিচিত্র খাঁচার মধ্যে কুন্তলদের পুরে ওয়ার্ডার চাবি দিয়ে চলে গেল। খাঁচার মধ্যে আরও জন-পঁচিশ-তিরিশ মানুষ-জন্তু পোরা রয়েছে। বিচিত্র খাঁচার মধ্যে এক বিচিত্রতর জগতে এসে পড়ল কুন্তল। এরা ঠিক কয়েদী নয়, বিচারাধীন কয়েদী।

ডোরাকাটা হাফ প্যান্ট, খাটো কুর্তা আর কাপড়ের টুপি মাথায় ষণ্ডামার্ক চেহারার একজন কয়েদী মুরুব্বির মত ভঙ্গিতে বললে, কি রে মতিলাল, আবার এয়েচিস? এই তো তিন মাস হয়নি, গেলি।

মতিলাল আজকের চালান। চুরির আসামী। মাড়ী শুদ্ধ দাঁত বার করে বললে, কি করি মেট্, কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে জেলখানার ওপর।

মেট ফতেলাল আবাব বললে, এই যে, গঙ্গাও এসেছ দেখছি! আরে বা! রঙ্গুও যে! আজ দেখছি সব পুরোনো ইয়ারদের আমদানী।

গঙ্গা নারীহরণ আর বঙ্গু দাঙ্গা ডাকাতির আসামী। দুজনেই দাগী। ফতেলালকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে, বড় হাজতে 'দাগীর' আমদানীই বেশি।

কুন্তলের দিকে নজব পড়তেই ফতেলাল দু-পা এগিয়ে এল তার কাছে। তার আপাদমস্তকে একবার চোখ বুলিয়ে বললে, স্বদেশী তো? বোমা না পিস্তল?

কুন্তল শুধু বললে, না। তারপর সরে গিয়ে এক কোণে ক্লান্তভাবে বসল। আশেপাশে তখন কম্বল বিছানো শুরু হয়ে গেছে। রাতের আস্তানা। বাড়ি নয়, ঘর নয় জেলখানা। তবু তিন হাত জায়গা নিয়ে কাড়াকাড়ি। সমস্ত খাঁচাটা কয়েদীর কলরবে একটা বড় ভীমরুলের চাকের মত ভনভন্ করছে।

এগিয়ে এল মতিলাল। মাড়ি শুদ্ধ দাঁতগুলি বার করে বললে, বসে বসেই রাত কাটাবেন নাকি? নেন, কম্বলখানা বিছিয়ে ফেলুন। বলে নিজেই বিছিয়ে দিলে কোণ ঘেঁসে।

নোংরা কম্বলে বসতে কুন্তলের গা ঘিন্‌ঘিন্ করছিল। তবু একধারে বসলো দেয়ালে হেলান দিয়ে। ক্লান্ত, অমানুষিক ক্লান্তি লাগছে তার।

মতিলাল বললে, পেথমবার আমারও অমন হয়েছিল বাবু। বড় হাজতে ঢুকে মনটা হু-হু করে উঠেছিল! কান্না পেয়ে গেছিল বৌটোর জন্যে। নতুন আসামী হলে অমন ধারা হয়। তারপর দু-একবার এখানে আসা-যাওয়া করলে সব ঠিক হয়ে যায়।

সুখের লাগিয়া

অতি সহজেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে উঠল মতিলাল। বোধ হয় দাগী আসামী চরিত্রের এও একটা লক্ষণ।

খান বাবু।

চোখ বুজে কুন্তল আচ্ছন্নের মত বসেছিল। চোখ মেলে দেখলে, মতিলালের হাতে সাদা কাগজে পাকানো সরু লম্বা একটা সিগাবেটের মত বস্তু।

টান্‌ন, মৌজ হবে। মনে কোন দুঃখু থাকবে না।

কি এটা? কুন্তল প্রশ্ন করলে।

আর একবার মাড়ি শুদ্ধ দাঁত দেখিযে মতিলাল বললে, আজ্ঞে চরস।

ও আমি খাই না মতিলাল।

তবে বিড়ি খাবেন? বিড়ি?

না।

দেশলাই বার কবে মতিলাল অগত্যা নিজেই ধরিয়ে ফেললে চরসের বিড়িটা।

কুন্তল এদিক-ওদিক চেয়ে দেখলে, শুধু মতি নয়, যে যাব কম্বলে বসে আরও অনেকেই মৌতাত শুরু করে দিয়েছে। চরসেব কটু গন্ধ লোহাব শিকেব ফাঁক দিয়ে বাইরে সান্ত্রীদেব নাকে পৌঁছলেও তাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত দেখা গেল না।

লাল কটাচুলো একটা জোয়ান এসে বসল কুন্তলের কম্বলে। পরণে ময়লা হাফ সার্ট আব কর্ডেব ট্রাউজার। তামাটে ফর্সা মুখে অজস্র তিল। দুহাতের কব্জির ওপর উল্কি দিয়ে নগ্ন মেয়ের ছবি আঁকা। এও আজকের চালান কুন্তলের সঙ্গে। আদালতে নাম শুনেছে পল্ জ্যাকসন, জাতে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, খুনের মামলাব আসামী।

পল্ এসে বললে, গট ম্যাচিস বাবু?

উত্তরে কুন্তল শুধু ঘাড নাডলে।

মতি তার ট্যাঁক থেকে দেশলাইটা বের করে দিলে, এই লাও।

বিড়ি-সিগ্রেট কুছ হ্যায়?

মতির মাড়ি শুদ্ধ দাঁত আবাব বেরিয়ে পড়ল। বললে, বা সাহেব, বেড়ে মজার লোক তো তুমি। দেশলাই নেই, বিড়ি-সিগ্রেট নেই, শুধু নেশার অভ্যেসটি নিয়ে খাতির জমাতে এসেছ? লাও, এটাতে দু-টান দিয়ে কেটে পড।

আধ-খাওয়া চরসের বিড়িটা এগিয়ে দিলে মতিলাল। পল্ সেটা ছোঁ মেরে নিয়ে বললে, থ্যাঙ্ক ইউ ইয়ার।

চুপ-চাপ বসে আছে কুন্তল। দুই চোখের দৃষ্টিতে গভীর অবসাদ। পল্ আর মতির এত কাছে বসেও সে যেন বহু দূরে।

চরসে টান দিয়ে পল্ বললে, হোয়াই মোরোজ বাবু? ঘাবড়া গিয়া কাহে?

কুন্তল পলের দিকে তাকাল। যেন কিছুই বুঝতে পারেনি, এমনি ভোঁতা নির্বাক সে দৃষ্টি।

মতি বললে, নতুন আসামী কিনা, তাই।

কিসের চার্জ? জালিয়াতি? য্যাবজ্ঞাবসন?

তিনশো দু-ধারা।

পল যেন খুশি হয়ে উঠল। বল্ল, ব্র্যাভো! এতে ঘাবড়াবার কি আছে? আমারও তো ওই চার্জ।

কুন্তল হঠাৎ অসহায়ের মত বলে ফেললে, কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল—ভাবতেও পারছি না!

পল বললে, নেভার মাইণ্ড! মানুষ হয়ে জন্মালে দু-চারটে মানুষ খুন করতেই হয়। দিস ইজ দি ল অব গড। কিছু ভেবো না ম্যান। ইট ড্রিঙ্ক য়্যাণ্ড বী মেরী।

চরসের প্রসাদে পলের মেজাজটা বোধ হয় খুবই খুলে গেল। হঠাৎ গলা ছেড়ে সে গান ধরলে:

লাভ মী, অর লিভ মী—

বাইরে থেকে সান্ত্রীর কড়া ধমক এলো। প্রত্যুত্তরে য়্যাংলো ভাষায় একটা কুৎসিত গালাগালি দিয়ে উঠল পল্। আর মাড়ি শুদ্ধ দাঁত বের করে হাসতে লাগল মতি।

আচ্ছন্নের মত আবার চোখ বুজলে কুন্তল। এখন, ঠিক এই মুহূর্তে পল্ আর মতির পাশে তাকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে কি সে কুন্তল চ্যাটার্জি, ভদ্রবংশের সন্তান, একজন নামকরা সুরকার, মিতালীর স্বামী, দীপুর বাবা?

তারপর একসময় নিশুতি হয়ে এল জেলখানার রাত্রি। নিস্তব্ধ হয়ে এল বড় হাজত। কয়েদীরা যে-যার কম্বলে শুয়ে চোখ বুজলো! জেগে রইল কুন্তল। দেয়ালে তেমনি ঠেস দিয়ে, ক্লান্ত অবসন্ন ভঙ্গিতে বসে। ভাবতে চেষ্টা করল মিতালী এখন কি ভাবছে। খবরটা কি পেয়েছে সে? কে জানে! প্রতি বছরের মত আজও কি সে জীবনের পুষ্পিত সাতাশে মাঘের রাত্রিকে মনে মনে স্বাগত জানাচ্ছে? না, ব্যর্থতায়, বেদনায়, লজ্জায়, ধিক্কারে অভিশাপ দিচ্ছে সাতাশে মাঘকে?

পাশের কম্বলে শুয়েছিল মতিলাল। কুন্তল হঠাৎ তাকে ধাক্কা দিয়ে ডাকলে, মতি, ও মতি!

ঘুম চোখে উঠে বসল মতিলাল।

কুন্তল বললে, শুনতে পাচ্ছো, কিসেব আওয়াজ বল তো? নিশুতি রাত্রির বুকের ওপর দিয়ে একটা ভারী চলমান আওয়াজ যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে: ঝম্‌র-ঝম্, ঝমর্-ঝম্, ঝমর্ ঝম্—

হাই তুলে মতি বললে, ও 'দায়মলি'দের ডাণ্ডা-বেড়ির আওয়াজ! শালারা কালাপানি যাবে কিনা, তাই ঘুমোতে পারে না—সারারাত পায়চারি করে।

কালাপানি যাবে? কেন মতি? প্রশ্ন করতে গিয়ে কুন্তলের গলাটা যেন শুকিয়ে এল।

খুনী আসামী যে! সাজা হয়ে গেছে।

মতি আবার ধুপ করে শুয়ে পড়ে চোখ বুজলো। আর আড়ষ্ট হয়ে রইল কুন্তল। তার মনে হতে লাগল, নিশুতি রাত্রির বুকের ওপর ওই চলমান ঝমর্ ঝম শব্দটা যেন ক্রমশ বাড়ছে। কয়েদখানার দেয়ালে দেয়ালে ঘা খেয়ে লৌহশৃঙ্খলের ওই বিশ্রী নিষ্ঠুর আওয়াজটা একটা রক্তপায়ী হিংস্র জন্তুর মত গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে তার দিকে। যেন ঝাঁপিয়ে পড়বে তারই বুকের ওপর।

প্রাণপণে দুই কান চেপে ধরল কুন্তল।

অতি বড় বেদনায় যেমন হাসি পায়, অতি বড় উৎকণ্ঠায় তেমনি ঘুমও আসে।

দীপুর পাশে জেগে থাকতে থাকতে মিতালীর চোখের পাতা বুজে এল। আর সেই ফাঁকে কখন ভোর হয়ে গেল সাতাশে মাঘের ব্যর্থ বিড়ম্বিত রাত্রি। শুকিয়ে গেল চোখের অশ্রু। মুছে গেল চন্দন-কুমকুমের টিপ। মলিন হয়ে গেল পায়ের আলতা। বৃথাই পুড়ে মরল মিতালীর সাধের কস্তুরী ধূপ খাটের শিয়রে। আর মিছেই পড়ে রইল কুন্তলের জন্যে সাধের রান্না।

সামনের দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের সাতাশে মাঘ তারিখটা ঠোঁট বেঁকিয়ে যেন মিতালিকে ব্যঙ্গ করতে লাগল। ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিলে মিতালী। মনে-প্রাণে যেন চাইল অন্ধকারের কালিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক তাদের বিয়ের তারিখ।

ঘুম ভাঙতে বেলা হল মিতালীর। বেলা হওয়াই স্বাভাবিক। এ-ঘুম ক্লান্তির ঘুম। সকালে উঠে অভ্যাস মত দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম বারান্দার টেবিলে রাখতে যাচ্ছিল মিতালী, হঠাৎ মনে পড়ে গেল কুন্তল নেই! কুন্তল আসে নি কাল সারারাত। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনের আকাশ, দু-খানা করে চিরে গত দিনের একটা ঘটনা বিদ্যুতের মত ঝলসে উঠল।

বেলা একটার থেকেই বার বার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিল মিতালী। এইবার এসে পড়বে কুন্তল। যাবার সময় বলে দিয়েছিল মিতালী, 'সকাল সকাল ফিরে এস'। কতক্ষণ আর লাগে ব্যাঙ্ক থেকে সার্টিফিকেট কিনতে আর ফুলের দোকানে সওদা করতে? ঠাকুরটাকে আজ সকাল সকাল বিদেয় করে দিয়েছে মিতালী। রান্নার পাট চুকিয়ে স্নান সেরে এসেছে। আর্শির সামনে বসে কপালে পরেছে চন্দন-কুমকুমের টিপ। পায়ে এঁকেছে আলতার রেখা। সাদা সাদা ফুলতোলা নীলাম্বরীর আঁচলে অল্প করে মেখেছে অনেক দিনের পুরোন 'খস' আতর। এটুকু প্রসাধন মিতালী প্রায়ই করে। তবু আজ থেকে থেকে কেমন যেন লজ্জা করছে তার। কুন্তলের সেই একটু-বিস্ময়, একটু-হাসি, একটু মোহ-মাখানো চোখের দৃষ্টি কল্পনা করে কেমন একটা সুখকর অনুভূতি হচ্ছে তার।

কিন্তু এত দেরি হচ্ছে কেন কুন্তলের? সার্টিফিকেট না হয় না-ই কেনা হত আজ। না-ই হত গোলাপ ফুলের সওদা। সামান্য ক'টা গোলাপের জন্যে এত

বেলা করার কি দরকার? বেলা করে বাড়ি ফেরাটা কুন্তলের সত্যিই স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। বিশ্রী লাগে মিতালীর।

কিন্তু বেলা হতে হতে বেলাও ফুরিয়ে আসে একসময়। দুটো, তিনটে, চারটে। কতক্ষণ পরমায়ু শীতের বেলার? মিতালীর ইচ্ছে হতে লাগল ঘড়ির কাঁটা দুটোকে চেপে ধরে। কুন্তলের ওপর শুধু রাগ-অভিমান নয়, কি একটা অনির্দেশ্য ভয় দলা পাকিয়ে মাঝে মাঝে আটকে যাচ্ছিল মিতালীর গলার কাছে। কেন আসছে না কুন্তল? কোথায় গেল সে? সিঁড়িতে কার পায়ের আওয়াজ হল না? পড়ি-কি-মরি করে ছুটে গেল মিতালী। না, কুন্তল নয়, ডাক-পিয়ন। লেটার বাক্সে চিঠি ফেলে চলে যাচ্ছে। দড়াম করে কপাট দিয়ে ঘরে ফিরে এল মিতালী। ইচ্ছে হচ্ছিল, এক টানে খুলে ফেলে নীলাম্বরী, মুছে ফেলে চন্দন-কুমকুম, সাবান ঘষে তুলে ফেলে পায়ের আলতা। বছরে একটা মাত্র দিন, জীবনেব পবম তিথি, তাও এমনি কবে নষ্ট করে দেবে কুন্তল! মিতালীর চোখ ফেটে জল আসতে গিয়ে থমকে থেমে গেল। সেই অনির্দেশ্য ভয়টা শুকনো পিণ্ডের মত দলা পাকিয়ে গলাব কাছটায় আবার আটকে ধরেছে। কুন্তল এখনও আসছে না কেন? কেন, কেন?

নড়ে উঠল দরজার কড়া। সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসল মিতালী। খুলবে না, এত সহজে সে দরজা খুলবে না কিছুতেই। সারাটা দিন যখন বাইরেই থেকেছে, তখন কি দরকার দয়া করে এত সকাল সকাল ফেরবার?

আবার নড়ে উঠল দরজার কড়া। আরও একবার।

উঠতেই হল মিতালীকে। সারাটা দিন খাওয়া নেই দাওয়া নেই, বেচারিকে দাঁড় করিয়ে রাখাটা ঠিক হবে না। সারা মুখে রাগ অভিমান আর চাপা হাসির ইন্দ্রধনুচ্ছটা নিয়ে দরজা খুলে দিল মিতালী।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই অনির্দেশ্য ভয় দলা পাকিয়ে তার শ্বাসনলীর কাছে আটকে গেল। এবারেও কুন্তল নয়, পুলিশ। একজন অফিসার আর জন-কয়েক সাদা পোশাকে কনস্টেবল।

মাথাটা সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে অফিসার প্রশ্ন করলে, কুন্তল চ্যাটার্জি আপনার কে হন?

স্বামী।— মিতালীর গলা দিয়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরোল।

সুখের লাগিয়া

কাল রাতে আপনার স্বামী কখন বেরিয়েছিলেন ? মনে করে বলুন তো ?

সাড়ে দশটা নাগাদ।

আর ফিরেছিলেন কখন ?

ভোরবেলা।

তাঁর পরণে কি ছিল মনে আছে ?

মিতালীর কথা জড়িয়ে আসছে। তবু বললে, গ্রে ফ্লানেল ট্রাউজার, সবুজ চেক টুইডের কোট আর লাল টাই।

'সবুজ কোট, লাল টাই'! পুনরাবৃত্তি করলেন অফিসার। আচ্ছা, আপনার স্বামী কোন্ সিগারেট ভালবাসেন ? গোল্ড ফ্লেক ?

মিতালী ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। নোটবইয়ে টুকে নিতে লাগলেন অফিসার। হঠাৎ সেই অনির্দেশ্য ভয়ের পিণ্ডটা সরে গেল গলার কাছ থেকে। শুকনো গলায় মিতালী চিৎকার করে উঠল, কোথায় তিনি—বলুন—কি হয়েছে তাঁর ?

নোটবইখানা পকেটে রাখতে রাখতে ভয়ঙ্কর শান্ত গলায় অফিসার বললেন, কাল রাতে একজন নর্তকী খুন হয়েছে। আপনার স্বামী গ্রেপ্তার হয়েছেন সেই খুনের চার্জে।

মিতালীর মনে হল, পায়ের নিচে মেঝেটা লিফটের মত নিচে নেমে যাচ্ছে। কত নিচে, কে জানে! অনেক দূর থেকে ভেসে এল অফিসারের গলা: এক্সিউজ মী। আপনাদের ঘরগুলো একবার সার্চ করতে চাই।

একপাশে সরে গিয়ে দরজার পথটা মিতালী ছেড়ে দিল। আশপাশের ফ্ল্যাট থেকে কয়েকজন সাক্ষী নিয়ে পুলিশের দল ভেতরে ঢুকে গেল। কতক্ষণ পরে তারা বেরিয়ে গিয়েছিল, মিতালী তা জানে না। শীত-সন্ধ্যার অন্ধকার তখন কালো দুশ্চিন্তার মত ঘনিয়ে এসেছে। সেই অন্ধকারে দরজার কপাটে ঠেস দিয়ে ভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল মিতালী।

হয়তো ঠিক সেই সময় কুন্তলকে নিয়ে কয়েদী-গাড়ি পৌছেছিল প্রেসিডেন্সী জেলের ফটকে।

লছমনের সঙ্গে পার্কে গিয়েছিল দীপু। ফিরে এসে মায়ের হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরতেই থর থর করে একবার কেঁপে উঠে হু-হু করে কেঁদে ফেলল মিতালী। স্নেহের উত্তাপে গললো কঠিন বেদনার তুষার।

সুখের লাগিয়া

ছেলেকে বুকে নিয়ে নতুন করে বুক বাঁধলো মিতালী। আলো জ্বাললো ঘরে। তারপর টেলিফোন করতে বসল ল্যান্সডাউন রোডের রমেন বোস, বার-য়্যাট ল'কে।

বকুল বাগানের মোড় ছাড়িয়ে দু-পা দক্ষিণে গেলেই লাল রঙের একখানা বহু পুরাতন বাড়ি। ল্যান্সডাউন রোডের ঠিক ওপরেই। যতটুকু জমির ওপর বাড়ি, চারপাশে তার অনেক বেশি জায়গা আগাছার জঙ্গলে ভর্তি। সেই জঙ্গলেব মাঝে মাঝে দু-চারটে আধভাঙা পাথরের মূর্তি বাড়িটির বিগত যৌবন দিনের সাক্ষ্য হয়ে এখন দাঁড়িয়ে আছে। এখন অবশ্য পৈতৃক আমলের এই জীর্ণ বাড়ি, আগাছা-ভর্তি কম্পাউণ্ড আর হাল আমলের একটা টেলিফোন ছাড়া ব্যারিষ্টার রমেন বোসের আর কিছুই নেই। কিন্তু ছিল আরও। খানতিনেক দামী মোটরকার, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত লাখ দেড়েক টাকা। সে টাকার প্রায় সবটাই জলে গেছে। জলে মানে লাল জলে। টাকা গেলেও লাল জলের অভ্যেসটা কিন্তু এখনও যায় নি রমেন বোসের।

অত বড় বাড়িটায় একা থাকে রমেন বোস। বন্ধু-বান্ধবের বহু পরামর্শেও ভাড়া দিতে রাজি হয়নি। টাকার নিতান্ত অভাবেও যেমন রাজি হয়নি হুইস্কি-ব্যাপারে স্কচের নিচে নামতে। রমেন বলে, আমার আভিজাত্য স্কচে।

দোতলার সব ঘরগুলোই বন্ধ থাকে। একতলার বিশাল ড্রয়িং রুমটাই এখন রমেনের আস্তানা। প্রতিদিনের মত আজও স্কচের বোতল খুলে বসেছিল রমেন। 'বারে' খেতে অনেক খরচ পড়ে, তাই ঘরেই খেতে হয়। বাইরের অন্ধকার শীতের কুয়াশা আর হাস্নাহানার গন্ধে মাখামাখি হয়ে আছে। গেলাসটা মুখে তুলতেই টেলিফোন বেজে উঠল। অবাক হয়ে গেলাসটা নামাল রমেন। অবাক হবারই কথা। সবাই জানে সন্ধ্যের পর রমেন আর রমেন বোস থাকে না, গাইকোয়ার বা নিজাম

গোছের একটা কিছু হয়ে যায়। একথা জেনেও তবু আবার ফোন করলে কে? রিসিভার তুলে নিল রমেন।

হ্যালো! কে?

টেলিফোনেব ওপার থেকে ভেসে এল, ব্যারিস্টার বোস আছেন?

কথা বলছি।

ও, রমুদা! আমি মিতা।

মিতা? কে যেন রমেনকে সজোরে ধাক্কা মারল।

হ্যাঁ, আমি মিতালী। আমাব বড় বিপদ রমুদা। একটিবার আসবে?

রমেনেব মুখে কথা জোগাল না। নেশার ঘোরে ভুল শুনছে নাকি? কিন্তু নেশা তো হয়নি এখনও!

টেলিফোনের ওপার থেকে আবাব শোনা গেল, সব কথা বলতে পারছি না, তুমি এস রমুদা—এখুনি—

অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে রমেন বললে, এখুনি? কাল সকালে গেলে হয় না?

না, না, এখুনি—আমি অপেক্ষা করছি। আসছ তো?

অগত্যা।

রিসিভার রেখে দিল রমেন। তারপর এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ফেলল তৃতীয় পেগটা। দশ বছর বাদে মিতালী তাকে ডেকেছে। চট করে বিশ্বাস হয় না, তবু ডাকটা অবিশ্বাস্য রকমে সত্য। দশ বছরের ব্যবধান মনে মনে এক পলকে ডিঙিয়ে গেল রমেন। সিগারেটের কুণ্ডলী পাকানো নীলচে ধোঁয়ার মধ্যে ঝাপসা হয়ে আসা বহু পুরাতন একটা ছবি যেন দেখতে পেল।

বোম্বাই। জাহাজঘাটা। বিলেতের জাহাজ এখুনি ছাড়বে। পোর্টারদের ওঠানামা কমে এসেছে। আর সপ্তমে উঠেছে খালাসীদের ব্যস্ততা। নানা জাতের নানা মানুষের ভিড়ে ছেয়ে গেছে জাহাজঘাটা। তাদের কলরবে সমুদ্র-কল্লোল চাপা পড়ে যাচ্ছে। সেই মুখর জনতার মাঝে একেবারে একা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মানুষ। রমেন আর মিতালী। সেদিনের সেই শীতের সকালে তাদের কাছে জাহাজ, খালাসী, ভিড়, কলরব, কিছুই ছিল না। ছিল

শুধু দুটি অপরিণতবুদ্ধি সবুজ মন। কতই বা বয়েস তখন মিতালীর? সতেরো কি আঠারো। আর রমেনের তখন টগবগে তাজা যৌবন।

বিলেতে গিয়ে চিঠি লিখবে তো রমুদা?

চিঠি? উঁহু, পৌঁছতে অনেক দেরি হয়। তার চেয়ে বরং মাঝে মাঝে ফ্লাই করে এসে তোমায় দেখে যাব।

ও, ঠাট্টা হচ্ছে?

মোটেই না। আচ্ছা, এক কাজ করলে কেমন হয়? ধরো, তুমিও আমার সঙ্গে জাহাজে উঠলে, তারপর সিঁড়িটা তুলে নেওয়া হল, তারপর আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলে জাহাজ, তুমি আর নামতে পারলে না।

জলতরঙ্গের মত হেসে উঠল মিতালী। বললে, চমৎকার আইডিয়া! কিন্তু উপায় নেই, (মেঘলা হয়ে এল মিতালীর মুখ) আমি গেলে বাবাকে দেখবে কে?

কপালের ওপর কয়েক গাছা চুল পাকাতে পাকাতে রমেন বললে, তাহলে আর একটা কাজ করা যেতে পারে। ধরো, জাহাজ ছেড়ে দিল, আমি গেলাম না বিলেত, পড়লাম না ব্যারিস্টারী।

ঠিক এই সময় শীতের স্বচ্ছ আকাশ স্পন্দিত করে জাহাজটা একবার ভোঁ দিয়ে উঠল। রমেনকে একটা ঠেলা দিয়ে উদ্বিগ্নগলায় মিতালী বলে উঠল, এই রে! তোমার মাথায় আবার ভূত চেপেছে দেখছি! শিগগির ওঠো জাহাজে, ওঠো বলছি।

বেশ, তাহলে উঠি। বলে শান্ত ছেলের মত রমেন পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে তার কোট টেনে ধরল মিতালী: বারে, অমনি চলে যাচ্ছ! কিছু বললে না!

রমেন ফিরে দাঁড়াল: তাইতো, কি বলি বল তো? কি বলা উচিত? কি বললে মানায়?

ফুলে উঠল মিতালীর গাল, ভারি হয়ে উঠল চোখের পাতা। বললে, যাও, কিছু বলতে হবে না, তোমার খালি ঠাট্টা!

হেসে ফেলল রমেন। তারপর অ্যাপোলো বন্দরের ভিড়-ব্যস্ততা-কলরব সব কিছু অগ্রাহ্য করে দু-হাতে মিতালীর মুখখানা একটা বড় চন্দ্রমল্লিকার মত আলতো করে তুলে ধরে গাঢ় গলায় বললে, আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো মিতা। শুধু আমারই জন্যে।

তারপর ছুটে চলে গেল রমেন। জাহাজের সিঁড়ি তখন তোলা হচ্ছে। জাহাজ ছেড়ে দেবার পরেও মিতালীকে সে দেখতে পাচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে দেখা গেল তার মেরুন রঙের গরম কোট। তারপর মিলিয়ে গেল একসময়।

অপেক্ষা মিতালী করেছিল বৈকি! কিন্তু দু-বছরের বদলে চার বছর কেটে গেলেও রমেন বোসের ফেরবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শোনা গেল, বিলেতে গিয়ে মদ্যপানকে সে আইনের চেয়ে বেশি আয়ত্ত করে ফেলেছে। তাছাড়া, কোন একটি লর্ডের মেয়ের নামও তার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাগর পেরিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে এসে পৌঁচেছে। কিন্তু ব্যারিস্টারীটাও সে পাশ করতে ভোলেনি।

চার বছর বাদে রমেন বোস বার-য়্যাট-ল যখন ভারতবর্ষে ফিরে এল, কুন্তল চ্যাটার্জির সঙ্গে মিতালীর তখন বিয়ে হয়ে গেছে। রমেন খবর পেলো, কিন্তু খোঁজ করলে না। সে জানত যে এতাদন ধরে শুধু মিতালী কেন, কোন মেয়েই অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। মনে মনে পরম নিশ্চিন্ত হয়ে, সে একমনে আইন আর হুইস্কি-চর্চা শুরু করে দিলে। মাস আষ্টেকে সাড়া পড়ে গেল হাইকোর্টে। ক্রিমিন্যাল কেসে তাক লাগিয়ে দিলে রমেন বোস। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তারপর থেকেই মামলার সময় রমেন বোসকে আদালতে প্রায়ই খুঁজে পাওয়া যেত না। সেই সময়টা তাকে পাওয়া যেত হয় গ্র্যাণ্ড-গ্রেট ইস্টার্নের 'বারে', নয় ল্যান্সডাউনের বাড়িতে ড্রয়িংরুমের শোফার উপর ঘুমন্ত অবস্থায়। ক্রমশঃ কমতে লাগল মক্কেলের আসা-যাওয়া। বেহাত হতে লাগল ব্রীফ। এটর্নি পাড়ায় রমেন বোসের নতুন নামকরণ হল মাতাল বোস।

অবস্থা বদলালেও রমেন কিন্তু বদলালো না। বন্ধু-বান্ধবের কাছে সে হাত পাতে না। আত্মসম্মানে লাগে বলেই নয়, আজকাল তারা আর টাকা দেয় না বলে। তবু নিত্য সন্ধ্যায় এক বোতল 'স্কচ' সে কোথা থেকে জোগাড় করে ভগবান জানে। নেহাৎ পুরোনো আইনজীবী বন্ধুরা পরামর্শের জন্যে এক-আধবার ডাকে বলেই কোনরকমে চলে যায়। এমন দিন গেছে যখন এক মাসে রমেন বোসের রোজগার হয়েছে বাইশ হাজার টাকা। আবার এমন দিনও গেছে যখন সারা মাসে বাইশটা টাকাও তার পকেটে আসে

নি। জীবনের এপিঠ ও-পিঠ দু-পিঠই দেখা আছে তার। সুতরাং কোন কিছুতেই সে আর আশ্চর্য হয় না।

কিন্তু এই টেলিফোনটা আজ তাকে সত্যিসত্যিই আশ্চর্য করে ছেড়েছে। কার গলার আওয়াজ বয়ে নিয়ে এল এই যন্ত্রটা? সে কি সত্যিই মিতালী? দীর্ঘ দশ বছর বাদে মিতালী যাকে ডেকে পাঠিয়েছে, সেও কি এই আজকের রমেন বোস? চেহারায় অবশ্য খুব পরিবর্তন আসে নি। মাথার সামনের চুলগুলো পাতলা আর অত্যধিক মদ্যপানের দরুণ নাকের ডগাটা ঈষৎ লালচে হয়েছে শুধু। কিন্তু এই দেহের খাঁচাটায় দশ বছর আগের সেই রমেন বোস কি সত্যিই আজও টিকে আছে? এতকাল নিশ্চিত ধারণা ছিল, সে নেই। কিন্তু আজ, উনিশশো পঞ্চান্ন সালের এক শীত-সন্ধ্যায়, তার মনে হচ্ছে আছে—বোম্বাইয়ের জাহাজঘাটার সেই পুরাতন রমেন বোস আজও অল্প অল্প বেঁচে আছে। তার মৃদু হৃদস্পন্দন সে আজ শুনতে পাচ্ছে তার বুকের মধ্যে। নইলে সেসব পুরণো কথা নতুন করে আবার মনে পড়বে কেন?

কিন্তু এসব লক্ষণ তো ভালো নয়। মাঝখান থেকে নেশাটাই মাটি হতে বসেছে। কবেকার কোন্ মিতালী তার সঙ্গে কতটুকু মিতালী করেছিল, সে হিসেব-নিকেশে কাজ কি আজ? রমেন বোস কখনও হৃদয়-দৌর্বল্যের প্রশ্রয় দেয় না। এত মদ খেয়েও তার হার্ট রীতিমত স্ট্রং আছে।

গেলাসে ডবল পেগ স্কচ ঢাললে রমেন। কিন্তু মুখে তুলতে গিয়েই মনে পড়ে গেল, মিতালী বলেছে বড় বিপদ। আর গলাটাও কেমন ভিজে-ভিজে ব্যাকুল। নাঃ, একবার যাওয়া উচিত। জীবন যে কোথায় কখন জটিল হয়ে ওঠে, কে বলতে পারে? মিতালীর বিপদটা যে কতখানি বিপদ, একবার জানা দরকার। গলাটাও কেমন ভিজে-ভিজে লাগল শুনতে। কেমন যেন কাঁপা-কাঁপা। দশ বছর আগে সে জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে যেমন করে বলেছিল, 'বারে! অমনি চলে যাচ্ছো? কিছু বললে না?'

এক চুমুকে গেলাসটা নিঃশেষ করে বেরিয়ে গেল রমেন। টালা পার্কের কাছে মিতালীর বাড়ি। ট্যাক্সি করে গেলে আর কতটুকু পথ?

*   *   *   *

সব কথা শুনে রমেন বললে, দুনিয়ায় এত লোক থাকতে শেষ কালে কিনা আমাকেই মুরুব্বি ভাবলে! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই পাকেনি মিতালী!

জলে ভেজা চোখ তুলে মিতালী বললে, বাবা বেঁচে নেই, আত্মীয়-পরিজন বলতেও কেউ নেই। এ বিপদে তোমার নামটাই আগে মনে হ'ল।

আমার নামটাই আগে মনে হল! যাক্, বাপ-মার দেওয়া নামটা সার্থক হল এতদিনে। (বাঁ হাতে একটা তুড়ি দিয়ে হেসে উঠল রমেন) কিন্তু আমি কি করতে পারি বল? কি হতে পারে আমাকে দিয়ে? কিচ্ছু না, নাথিং য়্যাটঅল!

এ বিপদে তোমরাই তো কাণ্ডারী রমুদা। হাজার হলেও তুমি ব্যারিস্টার।

চেয়ার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে রমেন বললে, ব্যারিস্টার! সে তো 'ওয়ান্স আপন এ টাইম'! এখন আমি বন্দুকের একটা ফাঁকা টোটা। তুমি বোধ হয় জানো না, আজ বছর কয়েক আদালতের সঙ্গে সম্পর্কই নেই আমার।

কেন রমুদা? কি হল? ক্রিমিন্যাল কেসে তোমার অত সুনাম ছিল! লোকে তোমায় সেকেণ্ড রাসবিহারী ঘোষ বলত!

তা বলতো! (পোড়া সিগারেট থেকে নতুন সিগারেট ধরালে রমেন) কিন্তু ব্যাপারটা কি হল জানো? আমি মদের প্রেমে পড়লাম বলে মক্কেলরা আমায় ডাইভোর্স করলে। আমিও তাই আর আদালত মাড়াই না।

তা হোক, তুমি এ কেসটা করো রমুদা।

না।

খাটের ধার থেকে মিতালী এসে দাঁড়াল রমেনের মুখোমুখি। তারপর সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, আমার এত বড় বিপদে তুমি দাঁড়াবে না? তুমি না একদিন আমায় ভালবেসেছিলে?

হো হো করে হেসে উঠল রমেন। যেন একটা ভারি মজার কথা শুনেছে। তারপর গলায় হাসির রেশ টেনে বললে, ফুটবল খেলা ছেড়ে দেবার পর পায়ে আমার একসময় বাত হয়েছিল। সে ব্যাধির মত আরও অনেক পুরনো ব্যাধিই আমার সেরে গেছে মিতা।

মিতালীর চোখের জল শুকিয়ে গেল। একটা তিক্ত স্বাদে কুঁচকে গেল ঠোঁটের প্রান্ত। বললে, টাকা দেব আমি। তোমার পুরো ফীজ।

পায়চারি বন্ধ হয়ে গেল রমেনের। ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, টাকা! রমেন বোসকে টাকা দেবে মিতালী!

আবার হেসে উঠল রমেন। তারপর সহজ গলায় বললে, আসল কথাটা হচ্ছে, নিজের ওপর আর বিশ্বাস নেই আমার। তাই কেস নিই না। বিশেষতঃ কেসটা যখন তোমার স্বামীর।

তবে কি করব আমি? কার কাছে যাবো?—মিতালী যেন অকুল পাথারে ডুবে যাচ্ছে।

মিতালীর দুই কাঁধ ধরে মৃদু একটা ঝাঁকানি দিয়ে রমেন বললে, এসময় নার্ভ শক্ত রাখো মিতা। আমার চেয়েও ভাল ব্যারিস্টার ঠিক করে দিচ্ছি—মামলা চালিয়ে যাও। তারপর—

নিজের কপালে রমেন একটা টোকা দিল।

টস্ টস্ করে জল গড়িয়ে এল মিতালীর গাল বেয়ে। বললে, যেমন করে পারো, ওকে তুমি খালাস করে আনো রমুদা? আমার মন বলছে ওকে মিথ্যে য়্যারেস্ট করেছে। অমন ভয়ানক কাজ ও কিছুতেই করতে পারে না।

দরজার কাছ অবধি এগিয়ে গিয়েছিল রমেন। সেইখান থেকেই বললে, তা কি এত সহজেই বলা যায় মিতা? মানুষ হচ্ছে বিধাতার আজব তামাসা। সে কখনও সাজে রাম, কখনও সাজে রাবণ। কে বলবে কোনটা তার আসল চেহারা? কিন্তু আর দেরি নয়, আমার বিরহিনী স্কচের বোতল পথ চেয়ে রয়েছে।

রমেনের হাসির আওয়াজটা সিঁড়ি দিয়ে ক্রমশঃ নিচে নেমে গেল আর, হঠাৎ ভয়ানক একটা সন্দেহে মনে মনে কেঁপে উঠল মিতালী। তার কানে বাজতে লাগল: মানুষ হচ্ছে বিধাতার আজব তামাসা। সে কখনও সাজে রাম, কখনও সাজে রাবণ। কে বলবে কোন্‌টা তার আসল চেহারা?

★

এগারো দিন বাদে।

দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে ঠিক তেমনি করেই বসে আছে কুন্তল। যেমন করে রোজ সকালে বসে থাকত আগে। মুখে দাড়ি জমেছে এগারো দিনের। চুলে তেল পড়েনি। ঝড়-খাওয়া নাবিকের মত ক্লান্ত, নিষ্প্রভ চেহারা। ডান হাতের দু-আঙুলে ধরা একটা জলন্ত সিগারেটের মুখে অনেকটা ছাই জমেছে লম্বা হয়ে। শীতের এলোমেলো হাওয়ায় টেবিলের ওপর আজকের কাগজ মৃদু মৃদু উড়ছে ফর্‌ফর্‌ করে।

গতকাল জামিন পেয়েছে কুন্তল। ধরা পড়ার এগারো দিন পরে তদন্ত শেষে ম্যাজিস্ট্রেট যখন কেসটা হাইকোর্টের দায়রা-জজের হাতে পাঠালেন। এমন কেসে জামিন পাওয়াটা সহজ নয়, অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে কুন্তলের ডিফেন্স-কাউন্সেল ব্যারিস্টার দত্তগুপ্তকে। কুন্তল শুধু এইটুকুই জানে। কিন্তু কার ব্যক্তিগত তদ্বিরে সে লৌহ-কপাটের বাইরে আসতে পারল, সেটা আজও অপ্রকাশ।

জামিন পেয়ে কুন্তল বাড়ি ফেরে নি। এক প্যাকেট সিগারেট কিনে গঙ্গার ধারে নির্জন একটা জায়গা বেছে নিয়ে চুপচাপ বসেছিল অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় অন্ধকার হয়ে এল চারিদিক। ওপারের চটকলে আলো জ্বলে উঠল, আর আকাশে তারা। সেই অন্ধকারে গা ঢেকে কুন্তল এসে দাঁড়াল ফ্ল্যাটের দরজায়। দিনের আলোয় কেন সে বাড়িতে ফিরতে পারল না, তার কারণটা তলিয়ে দেখতে সাহস হয় নি তার।

আশ্চর্য, মিতালীও কোন প্রশ্ন করে নি। কেন ধরা পড়ল কুন্তল, কি করে ধরা পড়ল, কেমন করে জড়িয়ে পড়ল একটা নর্তকী-খুনের মত জঘন্য ব্যাপারে, কিছুই জানতে চায় নি। এমন কি জামিনে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ফিরতেই বা রাত হল কেন, তারও কৈফিয়ৎ চায় নি। যেন রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে ফেরাটাই আজ কুন্তলের পক্ষে স্বাভাবিক। হাজত-ফেরৎ স্বামী সম্পর্কে মিতালীর এই কঠিন উদাসীনতার মূলে ছিল একটা

চক্ষুলজ্জা। কোন প্রশ্ন করলে পাছে কুন্তল কিছু মনে করে, কষ্ট পায়। কিন্তু এই চক্ষুলজ্জার আড়ালে আর একটা জিনিসও লুকিয়ে ছিল। সেটা হচ্ছে ওঝার শিকড় ছোঁয়ানো সাপের মত ঝিমিয়ে পড়া একটা বিষাক্ত সন্দেহ। কোন প্রশ্নের উত্তরে যদি ভয়ঙ্কর কিছু শুনতে হয়! তাই কুন্তলকে দরজা খুলে দিয়ে একটা প্রশ্নও করে নি সে। নীরবে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে সে শুধু তাকিয়ে ছিল। দেখছিল, এগারো দিন দাড়ি কামানো হয় নি আর মাথায় তেল পড়ে নি বলে কী লক্ষ্মীছাড়ার মতই না দেখাচ্ছে কুন্তলকে। এই কি তার সাতাশে মাঘের বাঞ্ছিত অতিথি? মাত্র এগারোটা দিনে মানুষ এত বদলে যায়?

কিন্তু কুন্তল কেন সহজ ভাবে কথা বলতে পারল না স্ত্রীর সঙ্গে? 'কেমন ছিলে' বা 'বড় রোগা হয়ে গেছো' এই ধরণের একটা মামুলি কুশল-প্রশ্নও তার মুখে এল না কেন? না, এটা অতি-সতর্ক অপরাধী-মনের স্বভাব।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র চেয়েছিল সে মিতালীর মুখের পানে। তার পরেই দ্রুত পায়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ভেতরে। অমন করে কেন তাকিয়েছিল মিতালী? কি দেখছিল সে? কুন্তলের মুখের কোথাও অপরাধের দাগ আছে কিনা? জেল-ফেরৎ আসামীর কোন লক্ষণ আছে কিনা তার মুখের গঠনে, চোখের চাউনিতে? তাহলে মিতালীও তাকে সন্দেহ করে! মনের মধ্যে একটা বিশ্রী সরীসৃপ কিলবিল করে উঠল। কুন্তল বুঝতে পারলে সেটা ঘৃণা। আর সে-ঘৃণা অন্য কেউ নয়—মিতালীরই প্রতি। বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই হাহাকার করে উঠল তার অন্তর। ঠিক সেই মুহূর্তে মিতালীর কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ঝঞ্ঝাহত পাখির মত কিছুক্ষণ পড়ে থাকতে পারলে কুন্তল হয়ত বেঁচে যেত। কিন্তু আড়ষ্ট দেহটা তার এক পাও এগোল না। দুর্জয় একটা অভিমান বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠতে লাগল শুধু।

দরজা বন্ধ করে মিতালী ঘরে ফিরে এল। শান্ত গলায় বললে, স্নানের ঘরে গরম জল রাখা আছে। তারপর আর একবার কুন্তলের পানে বোবা চোখে তাকিয়ে চলে গেল রান্না ঘরে।

এগারো দিন আগে ওরা শুধু স্বামী-স্ত্রী-ছিল না, ছিল প্রেমিক-প্রেমিকা। আর আজ? কোন রেল-ষ্টেশনের ওয়েটিংরুমে দুটি আলাপী যাত্রী যেন।

খাটের ওপর ঘুমে নেতিয়েছিল দীপু। সেদিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা

সুখের লাগিয়া

কেমন করে উঠল কুন্তলের। দু-হাত বাড়িয়ে ঘুমন্ত ছেলেকে বুকে তুলে নিতে গিয়েই থমকে থেমে গেল সে। না, এখন নয়, আগে স্নান সেরে আসুক, ধুয়ে আসুক বড় হাজতের অদৃশ্য ক্লেদ।

স্নান সেরে আসতেই খাবার গরম করে টেবিলে সাজিয়ে দিলে মিতালী। পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'এটা খাও', 'ওটা ফেলে রেখো না'। আগে যেমন রোজই বলতো। মনটা হাল্‌কা হয়ে এল কুন্তলের। মনে হতে লাগল, কোন রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুমে নয়, সত্যিই নিজের সংসারে নিজের ঘবেব মধ্যেই ফিরে এসেছে সে।

খেতে খেতে হঠাৎ একবাব মুখ তুলে চাইলে কুন্তল। দু জোড়া চোখ পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেলো। একটা মোটরের হেডলাইটের ওপব যেমন উল্টো দিক থেকে আবেকটা মোটরের হেডলাইট এসে পড়ে। একটা মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই 'আর দু-খানা লুচি আনি' বলে মিতালী চলে গেল। আর, জ্বোরো রুগীর মত মুখটা তেতো হয়ে গেল কুন্তলের। মিতালী যখন লুচি নিয়ে ফিরে এল, কুন্তলের তখন আচানো হয়ে গেছে।

সেদিন একই বিছানায় শুয়ে দুটি মানুষের চোখে ঘুম আসেনি অনেক রাত অবধি। উষ্ণ অশ্রুজলে বালিশ ভিজিয়ে একজন ভাবছিল, ও কেন এখনও চুপ করে আছে? মুখ ফুটে অন্তত একটিবার কেন বলছে না, 'আমি তোমাব সেই কুন্তল, মিতা! কোন পাপ, কোন মালিন্য স্পর্শ করে নি আমায়!' বলুক, হে ভগবান, একবার ও বলুক। সে-কথায় বিশ্বাস করে বাঁচুক মিতালী।

আর একজন বিনিদ্র নিশীথের অদৃশ্য কণ্টক শয্যায় ছটফট করতে করতে ভাবছিল, ও কেন এখনও চুপ করে আছে? মুখ ফুটে অন্তত একটিবার কেন বলছে না, 'তুমি কি সত্যই অপরাধ করে এসেছ কুন্তল? মিতালীকে ভালবেসেও এত বড় পাপ করতে পারলে?' বলুক, বিধাতা, একবার ও বলুক। সে-কথার উত্তর দিয়ে বাঁচুক কুন্তল।

তবু চুপ করেই রইল দুজন। সারা রাত। আর, দুজনের মাঝখানে ছোট্ট দীপু দুজনের গায়ে দুটি পা তুলে দিয়ে পরম আরামে ঘুমিয়ে রইল। একটা সেতুর মত।

*   *   *   *

চা নিয়ে এল মিতালী। খবরের কাগজটা টেনে নিল কুন্তল। তাড়াতাড়ি উল্টে দিল প্রথম পাতাটা।

মিতালী বললে, আজ কি বেবোবে কোথাও?

চায়ের পেয়ালায় দৃষ্টি রেখে কুন্তল বললে, ভাবছি বেবোব

কখন?

দুপুরে?

দাড়ি কামাবাব সরঞ্জামগুলো দেবো?

নিরুৎসাহ গলায় কুন্তল শুধু বললে, দাও।

হেঁট হয়ে চায়েব কাপে চুমুক দিতে গিয়ে কুন্তল অনুভব করলে. মিতালী যায় নি, দাঁড়িয়েই আছে। হয়তো সেই ঠাণ্ডা অপচল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে কুন্তলেব দিকে। দৃষ্টিটা সর্বাঙ্গে বিঁধতে লাগল যেন। কেন ও দাঁড়িয়ে আছে এখনও? আব কি বলতে চায়, বলে ফেললেই তো পারে। গোয়েন্দা-পুলিশেব মত সদা-সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে কুন্তলেব প্রতিটি মুহূর্ত কেন ও অতিষ্ঠ করে তুলছে?

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মাথা তুললো কুন্তল। মিতালী বললে, তোমার একটা ফোন এসেছিল—গত পরশু।

ফোন? কোত্থেকে?

রূপকথা পিকচার্স থেকে।

কি বলেছে?

বলেছে, এ ছবিতে কুন্তলবাবুকে আমবা নিতে পারলাম না। য়্যাডভ্যান্সের টাকাটা অবশ্য ইচ্ছে করলে উনি ফেরৎ নাও দিতে পারেন।

ও।

কুন্তলের দৃষ্টি আবাব চায়েব পেয়ালায় নেমে এল। মিতালীও চলে যাচ্ছিল ফিরে, ঠিক এই সময় নিচ থেকে একটা হৈ-হৈ শোনা গেল। বারান্দার নিচেই একটা বড চত্বর। ফ্ল্যাটবাড়ির ভাডাটেদের ছেলে-পুলেরা সকাল-বিকেল খেলা করে এখানে। কলরবটা সেইখান থেকেই আসছে মনে হল। মিতালী ঝুঁকে পড়ল বারান্দাব রেলিং-এ ভর দিয়ে। দেখলে, একতলার

চত্বরে যে নাটক চলছে, তার নায়ক স্বয়ং দীপু। দীপুর সার্ট ছেঁড়া, প্যাণ্টে ধুলো লাগা। লছমন তাকে ধরে রেখেছে। আর, তারই সামনে হাত তিনেক দূরে দু-হাতে নাক চেপে ধুলোর ওপর বসে বসে দীপুরই খেলার সাথী হাবুল কাঁদছে, না ডাকাত-পড়া চিৎকার করছে, বোঝা মুস্কিল। কিন্তু তার চিৎকারকেও ছাপিয়ে যার ফাটা কাঁসরের মত গলা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে, তিনি হচ্ছেন হাবুলের প্রৌঢ়া পিসিমা। হাবুলের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে দুই হাত কোমরে দিয়ে তিনি বলছিলেন, দীপুর মত সর্বনেশে ছেলে তিনি জীবনে দেখেন নি। হাবুলের নাকটা একেবারে আদা-ছেঁচা করে দিয়েছে! আসুক হাবুলের বাপ বাজার থেকে। তাকে দিয়ে তিনি পুলিশে ডায়েরী করিয়ে ছাড়বেন!

ছেলে-বুড়ো মেশানো ছোটখাটো একটি জনতা পরমানন্দে এই নাটকটি উপভোগ করছিল দাঁড়িয়ে। তাদের রসাস্বাদনে ব্যাঘাত ঘটিয়ে মিতালী ডাক দিলে, দীপু, ওপরে এস।

একটু পরেই সিঁড়িতে দুপদাপ আওয়াজ শোনা গেল। লছমনের সঙ্গে হাজির হল দীপু। কোঁকড়ানো চুলের গোছা কপালের ওপর এসে পড়েছে। মুখ-চোখ তখনও রাগে লাল হয়ে আছে।

গম্ভীর গলায় মিতালী বললে, হাবুলকে মেরেছ কেন?

বাচ্চা বাইসনের মত ঘাড় বেঁকিয়ে দীপু জবাব দিলে, বেশ করেছি! আবার মারব।

ধমক দিয়ে উঠল মিতালী, চুপ করো, অসভ্য ছেলে! কেন হাবুলকে মারবে শুনি?

তেমনি ঘাড় বেঁকিয়ে দীপু বললে, ও কেন আমাকে খুনে-ডাকতের ছেলে বলবে?

হঠাৎ যেন সাইরেন বেজে উঠল। দীপুর কান ধরবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল মিতালী, কয়েক মুহূর্তের জন্যে পঙ্গু হয়ে গেল হাতটা। মুখখানা তার একবার আগুনের মত টকটকে হয়ে উঠেই আবার অস্বাভাবিক সাদা হয়ে গেল। কোনমতে সে শুধু বলতে পারল, ঘরে যাও।

ঘরেই যাচ্ছিল দীপু, তার আগে কুন্তল ডাকলে, শোন।

দীপু কাছে এসে দাঁড়াল।

কুন্তল বললে, হাবুলরা ওইদিকে তিনতলার ফ্ল্যাটে থাকে, না?

দীপু ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

'আচ্ছা, তুমি যাও' বলে কুন্তল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল। মিতালী পথ আগলে দাঁড়াল: কোথায় যাচ্ছ?

হাবুলের বাবার সঙ্গে একবার দেখা করব।

অস্বাভাবিক শান্ত গলায় মিতালী বললে, না, যেতে হবে না।

যেতে হবে না! গায়ে কেউ কালি ছিটোলেও চুপ করে থাকতে হবে নাকি? কি বলছ তুমি?

কুন্তলের নাকের রন্ধ্র দুটো ফুলে ফুলে উঠছে। এগারো দিনের দাড়ি আর রুক্ষ চুলের মাঝখানে চোখ দুটো খর হয়ে জ্বলছে।

মিতালী যেন তার তাপ অনুভব করতে পারল। তবু সে তেমনি শান্ত গলায় বললে, ঠিকই বলছি। ঝগড়া করে কেলেঙ্কারী বাড়াবার দরকার নেই।

কিন্তু দীপুর মুখ চেয়ে হাবুলের মুখটা বন্ধ করা দরকার।

আর পারল না মিতালী, তার শান্ত গলা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। বললে, থামো। কার মুখে হাত চাপা দেবে? হাবুলের মুখ বন্ধ করলেই কি সকলের মুখ বন্ধ হবে? জোর করে মুছতে চাইলেই সব কালি মোছা যায় না!

কান্না চাপতে চাপতে দ্রুত বেগে চলে গেল মিতালী। আর, হঠাৎ যেন একেবারে নিভে গিয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল কুন্তল। হু-হু করে এল এলোমেলো দমকা হাওয়া। ফর্‌ফর্‌ করে আবার উল্টে গেল খবরের কাগজের প্রথম পাতাটা। কুন্তল চেয়ে দেখলে, বড় বড হরফে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে খবরটা:

নর্তকী-হত্যার অভিযোগে সুরশিল্পী কুন্তল চ্যাটার্জি

জামিনে মুক্তিলাভ

মিতালী ঠিকই বলেছে। কার মুখে হাত চাপা দেবে কুন্তল?

*   *   *   *

'দেখে নেবেন স্যার, এবারের ছবি আপনার সিওর হিট!' ডান হাতের দু-আঙুলে এক টিপ নস্য টি.প প্রচার সচিব বটু মল্লিক বলছিল, গল্পটা কাল কাগজ-

ওয়ালাদের শোনালাম। শুনে সকলেই একবাক্যে বললে, ভারি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল গল্প তো!

প্রকাণ্ড ঝকমকে টেবিলের ওপাশে ঘোরানো চেয়ারে একতাল কাঁচাগোল্লা সন্দেশের মত বসেছিলেন প্রোডিউসার কন্দর্পকান্তি নন্দী। প্রচারসচিবের কথা শুনে বলে উঠলেন, কি বলেছে? ইন্‌টালেকচুয়াল? গল্পটা বুঝতে পারে নি নির্ঘাৎ!

বটু মল্লিক তখনও নস্যির টিপ ছাড়ে নি। জিব কেটে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, অমন কথা বলবেন না স্যার! তাঁরা সব গুণী ব্যক্তি। তারপর হঠাৎ প্রবল উৎসাহে গলার শির ফুলিয়ে বলে উঠল, এ ছবি রাষ্ট্রপতি পদক না পেয়ে যায় না। আমি বলি কি স্যার, দিন—ভেনিসেও পাঠিয়ে দিন। আন্তর্জাতিক ছবির জগতেও আপনার নামটা অক্ষয় হয়ে থাক।

কন্দর্পকান্তি বললেন, বটে! মাত্র সাতটা দিন সুটিং হয়েছে, তাইতেই তুমি ছবির ভবিষ্যৎ এতখানি সমঝে ফেললে বটু! ব্যাপারটা কি বলো দিকি? কিছু ক্যাশের দরকার হয়েছে নাকি?

বিনয়ে বটু মল্লিক বিগলিত হয়ে গেল। নস্যির টিপ সমেত হাতটা টেবিলের তলা দিয়ে বাড়িয়ে বললে, পায়ের ধুলো দিন স্যার। আপনি সাক্ষাৎ অন্তর্যামী।

ঘোরানো চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে কন্দর্পকান্তি বললেন, সকলের না হলেও তোমাদের অন্তর্যামী বৈকি! নইলে কি আর তোমাদের চড়িয়ে এই 'রূপকথা পিকচার্স' চালাতে পারতাম! তোমরা হয়তো ভাবো আমার চুলের মধ্যে শিং আর মোজার মধ্যে ক্ষুর লুকানো আছে।

নিজের রসিকতায় কন্দর্পকান্তি নিজেই টেনে টেনে হাসতে লাগলেন। অদ্ভুত সেই হাসি। অনেকটা হাঁপানি রুগীর কাশির মত দমক দিয়ে দিয়ে।

কিন্তু হঠাৎ একটা হেঁচকি তুলে কন্দর্পকান্তির হাসি থেমে গেল। অন্য সবাই, যারা প্রোডিউসার হাসছে বলে হাসা উচিত ভেবে হাঁ করেছিল, তারাও একদম চুপ। পিনটুকু পড়লেও বুঝি বা শোনা যায়, এমনি স্তব্ধতা।

তারপরে কন্দর্পকান্তিই প্রথমে কথা কইলেন। সৌজন্যের অবতার হয়ে

বললেন, আসুন কুন্তলবাবু। আসতে আজ্ঞা হোক। জামিন :পেলেন তাহলে ? পাবেন বৈকি ! আপনারা হলেন মানী লোক !

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কুন্তল 'রূপকথা পিকচাস''র অফিস ঘরের এধার থেকে ওধার অবধি একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। তারপর সোজা এসে দাঁড়াল প্রোডিউসারের টেবিলের মুখোমুখি। আপ্যায়নের ভঙ্গিতে কন্দর্পকান্তি বললেন, বসুন। চা আনতে বলি ? না কফি ?

কোনটাই নয়।—একটা চেয়ার টেনে নিয়ে কুন্তল বললে, আপনি অনর্থক ব্যস্ত হবেন না কন্দর্পবাবু।

হাত জোড় করে কন্দর্পকান্তি বললেন, বিলক্ষণ ! আপনারা গুণী লোক ; আপনাদের সেবা করাই তো আমার কাজ।—তারপর, কি মনে করে বলুন তো ?

কন্দর্পকান্তির অতি অমায়িকতা কুন্তলের আদপেই ভাল লাগছিল না। কথাটা তাই সোজাসুজিই পাড়লে : শুনলাম কিছুদিন আগে আমার বাড়িতে আপনি ফোন করেছিলেন।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি তখন প্রেসিডেন্সী—মানে ইয়েতে ছিলেন।

কুন্তলের কান দুটো ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, আমার সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করা সত্ত্বেও, আজকের কাগজে দেখলাম, আপনার নতুন ছবির মিউজিক অন্য লোক করছেন। হঠাৎ আপনাব মত পাল্টানোর কারণটা কি জানতে এলাম।

গলায় মধু ঢেলে কন্দর্পকান্তি বললেন, কারণটা কি জানেন ? মানে আপনারা হলেন গুণী লোক—শিল্পী ! মন-মেজাজ ঠিক না থাকলে ভাল সুর বেরোবে কেমন করে, বলুন ? যে জালে জড়িয়ে পড়েছেন, সে জাল কেটে না বেরুনো অবধি আপনাকে বিরক্ত করা কি উচিত হবে ? তাই ভেবে-চিন্তে এ ছবিটি থেকে আপনাকে বাদই দিলাম।

কপালের দুটো পাশ দপ্‌দপ্‌ করছিল কুন্তলের। একটা শুকনো হাসিতে ঠোঁটের রেখা বেঁকে গেল তার। বললে, আপনি সত্যিই বড় বিবেচক কন্দর্পবাবু।

সখেদে কন্দর্পকান্তি বলে উঠলেন, নারী বড় বিষম চীজ মশাই ! ওরই জন্যে

সোনার লঙ্কা পুড়ল, ট্রয়নগর ছারখার হল! তবু আহাম্মকেরা বোঝে না—ঘরে সতীলক্ষ্মী স্ত্রী ফেলে মরতে ছুটে যায় ডাইনীর কাছে!

ত্বরিতে উঠে দাঁড়াল কুন্তল। বললে, অর্থাৎ?

তার মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে কেমন একটু থতিয়ে গেলেন কন্দর্পকান্তি। দেঁতো হাসি হেসে বললেন, মানে, পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে আর কি! আপনি তো আর হেঁজিপেঁজি লোক নয়—সুর-জগতের একটা দিকপাল—

ও-কথা থাক। আপনার য়্যাডভান্সের টাকাটা কালই ফেরত পেয়ে যাবেন কন্দর্পবাবু। নমস্কার।

দরজা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কুন্তলের কানে এলো হাঁপানি রুগীর কাশির মত দমক দিয়ে দিয়ে সেই বিচিত্র হাসি! এবারে কন্দর্পকান্তি একা নয়, রামভক্ত কপিদলের মত বটু মল্লিকের দলও হাসছে।

ম্যাডান ষ্ট্রীট থেকে ধর্মতলা। রূপকথা পিকচার্স থেকে বাণী চিত্রম। হেঁটেই চলল কুন্তল।

পুরাতন ইজিচেয়ারটির ওপর হাঁটু মুড়ে বসেছিলেন বাণী চিত্রমের একমাত্র সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গদাই পাল। বেশভূষায় অত্যন্ত সৌখীন। চেহারায় ডিসপেপসিয়ার সজীব বিজ্ঞাপন। গতকালকের স্যুটিংয়ে তিরাশী কাপ চা কেন খরচ হয়েছে, এই নিয়ে প্রোডাকসনের ছোকরা বিপিনকে তিনি যৎপরোনাস্তি ধমকাচ্ছিলেন। ঠিক এই সময় ইজি-চেয়ারের পেছন থেকে কুন্তলের স্বভাব-গম্ভীর গলা শোনা গেল: নমস্কার গদাইবাবু!

বিপিনকে তিনি বলতে চাইছেন, 'এই করেই তুমি কোম্পানিকে ডোবাবে,', কিন্তু পিছন দিকে একবার তাকিয়েই কেম্পানীর কো পর্যন্ত এসে গদাইবাবু আর এগোতে পারলেন না। বারকয়েক কো-কো করার পর কুন্তল পিছন থেকে সামনে এসে প্রশ্ন করল, কি হল, অমন করছেন কেন?

জবাব দিল বিপিন। একগাল হেসে বললে, বড়বাবু মেক্-আপ করা খুনী দেখেছেন বটে, কিন্তু ওরিজিন্যাল খুনী তো কখনও চোখে দেখেন নি, তাই আপনাকে দেখে কেমন নার্ভাস হয়ে পড়েছেন বোধ হয়।

হোঁচট-খাওয়া জিবটাকে গদাই পাল ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন।

খিঁচিয়ে উঠে বিপিনকে বললেন, ইডিয়ট! কোথায় কি বলতে হয়, কোন জ্ঞান নেই। যাও, এখান থেকে!

তিরাশী কাপ চায়ের হিসেব থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বিপিন নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিরস গলায় গদাইবাবু বললেন, কি খবর কুন্তলবাবু?

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলে কুন্তল। বলল, খবর জানতেই তো এলাম। 'আশাবরী' ছবির গান-রেকর্ডিং কবে রাখছেন?

তেমনি বিরস মুখে গদাইবাবু বললেন, কিছু মনে করবেন না কুন্তলবাবু, আপনাকে কাজ দেওয়া আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

সম্ভব নয়! কারণ?

চোঁয়া ঢেঁকুর উঠলে মানুষের মুখটা যেমন বিশ্রী হয়ে যায়, তেমনি বিশ্রী মুখে গদাইবাবু বলতে লাগলেন, আমি বড় ফ্র্যাঙ্ক লোক মশাই, ঢেকে-ঢেকে বলা পছন্দ করি না। আমার 'বাণীচিত্রমে' পাঁচটা, ভদ্রলোক কাজ করেন, সেখানে একজন খুনীকে রাখলে প্রতিষ্ঠানের বদনাম হতে পারে কিনা আপনিই ভেবে দেখুন।

আর একটু হলেই কুন্তল চিৎকার করে বলে উঠত, 'থামুন!' কিন্তু তার বদলে সংযত ভদ্র কণ্ঠেই বললে, আমার মামলা এখনও শুরু হয় নি, পুলিশের তদন্তও শেষ হয় নি, অথচ আপনি আমাকে খুনী সাব্যস্ত করে বসলেন। আশ্চর্য!

অবিশ্বাসের হাসি হেসে গদাইবাবু বললেন, গোয়েন্দা পুলিশ ঘাস খায় না, বুঝলেন কুন্তলবাবু! প্রমাণ না পেলে কি তারা কাউকে ধরে? আর আশ্চর্যের কথা বলছেন—আশ্চর্য আপনি নয়, আমরাই হয়েছি। আপনার মত একটা কালচার্‌ড ইয়ং ম্যান—শেষ কালে কিনা একটা নাচওয়ালীর প্রেমে পড়ে—ছিঃ!

ডিস্‌পেপসিয়ার সঞ্জীবনী বিজ্ঞাপন আবার চায়ের স্লিপে মনোনিবেশ করলেন। আর কোন কথা বলার ছিল না কুন্তলের, বলার প্রবৃত্তিও ছিল না। নিঃশব্দে সে উঠে চলে গেল।

তারপর একে একে আলোছায়া, কাকলী পিকচার্স, স্ক্রীন প্লে এবং নবজীবন

প্রোডাকসনস্। কুন্তলের সামনে সব দরজাই একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সর্বত্রই একই কথা। তোমার গায়ে খুনের দাগ লেগেছে, তুমি খুনী, ভদ্র-সমাজে অচল, সংসারে বাতিল। এই সেদিনও একজন নামকরা শিল্পী, ভদ্র চরিত্রবান যুবক বলে জনসমাজে তার যে পরিচয় ছিল, লোকে তা রাতারাতিই ভুলে গেল? কালো ধোঁয়া আর কালো কুয়াশায় কলঙ্কিত শহরের ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কুন্তলের হাসি পেলো। মানুষের সুনাম কত ঠুন্‌কো। তার চেয়েও ঠুন্‌কো মানুষের কাছে মানুষের পরিচয়।

গায়ে একটা ধাক্কা লাগতেই ফিরে তাকায় কুন্তল। দেখে, অবিনাশ মিত্তির পান খাওয়া দাঁত বার করে বলছে, মামলার তারিখ কবে পড়ল হে!

অবিনাশ তার পিসতুতো সম্বন্ধি। দাঁতে দাঁত চেপে কুন্তল বলে, কেন, যাবে নাকি কোর্টে?

অবিনাশ উৎসাহিত হয়ে বলে, যাব না? কি নাম যেন নাচউলীটার—শোভা ইম্যানুয়েল, না? বাঁধা ছিল বুঝি? কদ্দিন?

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে কুন্তল বললে, অনেক দিন।

একটা কাঠি বের করে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে অবিনাশ বললে, এঃ! ছ্যা-ছ্যা, এমন ভুলও মানুষে করে! বুদ্ধি খাটিয়ে খুনের দায়টা আর কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলে না?

খুব সহজভাবে কুন্তল বললে, তাই তো দিয়েছি। তোমার নামটাই বলেছি পুলিশের কাছে।

'ওসব ইয়ার্কি আমি ভালোবাসি না মাইরি!' বলতে বলতে কাঠিহাতে অবিনাশ ভিড়ের মধ্যে ছিটকে সরে গেল। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কুন্তল হঠাৎ হা-হা করে হাসতে শুরু করলে পাগলের মত। আর হাসতে হাসতেই তার মনে পড়ে গেল, পরশু তার মামলার প্রথম শুনানী।

জুরিদের সামনে খুনী আসামী কুন্তলের ভাগ্য নিয়ে আইনের পাশা খেলা শুরু হবে।

কে জিতবে? আইন না সত্য? মানুষ না বিধাতা?

★

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন পাবলিক প্রসিকিউটর সুরেন ভাদুড়ি। দুলে উঠল তাঁর কালো গাউন। কাঁচা-পাকা ছাঁটা গোঁফের নিচে চাপা ঠোঁটে অবজ্ঞা আর অহঙ্কার ঝিলিক দিয়ে উঠল। সিংহের মত ঘাড় বেঁকিয়ে একবার তিনি তাকালেন বাঁ দিক থেকে ডান দিকে। লোকে গিস্‌গিস্‌ করছে আদালত ঘর। বোধ করি খুশি হলেন তিনি। তারপর মঞ্চে দাঁড়ানো পেশাদার বাগ্মীর মত আবেগময় গলায় বলতে শুরু করলেন, ইওর অনার, আজ যে মামলার বিচারের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, সেটি কোন সাধারণ মামলা নয়। পৃথিবীতে জঘন্যতম পাপ হল নরহত্যা। এই মামলা হল সেই জঘন্যতম পাপের কাহিনী। এর পিছনে আছে এক হতভাগিনীর জীবন-নাট্যের শোচনীয় পরিণতি! ইওর অনার, আজ আমি আদালতের সামনে সেই হতভাগিনীর জীবন-নাট্যের যবনিকা তুলে ধরার অনুমতি চাই।

পাবলিক প্রসিকিউটর ভাদুড়ি একবার থামলেন। টেবিলের ওপর কাচের গ্লাসে জল ছিল, এক চুমুক খেয়ে ফের শুরু করলেন, ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের শোভা ইম্যানুয়েল জাতে মারাঠি হলেও ধর্মে ছিল কৃশ্চান। তার পেশা ছিল নাচ। মাঝে মাঝে সে কোন কোন নাচের দলের সঙ্গে শহরের বাইরে টুরে যেত বটে, কিন্তু বেশির ভাগ সময় তাকে দেখা যেত কলকাতার নামকরা হোটেলগুলির ক্যাবারে নাচের আসরে। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে, তার পেশার দরুণ নানান্ লোকের সংস্রবে তাকে আসতে হত। সন্ধ্যের পর প্রায়ই তার ঘরে বন্ধুবান্ধবের সমাগম ঘটতো এবং নাচের প্রোগ্রাম না থাকলে মধ্যরাত্রির আগে তার ঘরের বাতি নিভতো না। হাসি-খুশি স্বভাব, মিশুকে প্রকৃতি আর সুঠাম যৌবনের জন্যে শহরের বিশেষ এক শ্রেণীর লোকের কাছে শোভা ইম্যানুয়েল অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে নাচের মাস্টার, বাজিয়ে আর সঙ্গীত-পরিচালক। শোভা যে খুব নির্মল চরিত্রের মেয়ে ছিল, আমি অবশ্য এমন ধারণা করতে বলছি না। সাধারণতঃ

নাচওয়ালীরা যা হয়, সেও তাই ছিল। কিন্তু সে কারও ক্ষতি করেছে, এমন কথা কখনও শোনা যায় নি। নাচ আর হাসি-হল্লার স্রোতে তার দিনগুলি তর্‌তর্ করে বয়ে যাচ্ছিল। তারপর এল সেই ভয়ানক রাত্রি। তারিখটা ছিল ছাব্বিশে মাঘ। শহরের বুকে তখন নেমেছে কুয়াশার রাত। ঘড়িতে তখন ঠিক বারোটা। শোভা ইম্যানুয়েল খুন হল। খুন হল তার নিজের ঘরে নিজেরই শয্যার উপরে। হতভাগিনী নর্তকীর জীবনের ওপর যবনিকা পাত হল নিতান্ত অসময়ে।

আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠল সুরেন ভাদুড়ির কণ্ঠস্বর। কোন ট্রাজিক দৃশ্যে থিয়েটারের অভিনেতারা যেমন গলা কাঁপায়। সিংহের মত গ্রীবাভঙ্গি করে আর একবার তিনি তাকালেন শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে। সমস্ত আদালত স্তব্ধ হয়ে শুনছে। মনে মনে আর একবার খুশি হলেন তিনি। গলাটা কেসে সাফ করে নিলেন, তারপর আবার বলতে লাগলেন, ময়না তদন্তের রিপোর্টে প্রকাশ, বিষ নয়, ছোরা নয়, রিভলবারের বুলেটও নয়—সিল্কের রুমাল বা ওইরকম একটুকরো কাপড়ের ফাঁস গলায় লাগিয়ে শোভা ইম্যানুয়েলকে দমবন্ধ করে মারা হয়েছে। অধিকাংশ খুনের ব্যাপারে ছোরা বা রিভলবার উত্তেজনা বশেই ব্যবহার করা হয়। কিন্তু, ইওর অনার, গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলাটা নিরুত্তেজ ঠাণ্ডা মাথার কাজ নয় কি? পাকা খুনীর পক্ষেই এমন নৃশংস-ভাবে খুন করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক কে? পুলিশ যাকে অভিযুক্ত করেছে, সেই কি প্রকৃত খুনী? সে বিচারের ভার আদালতের হাতে। (ভাদুড়ির গলা ধাপে ধাপে চড়তে থাকে) যুক্তি, সাক্ষ্য এবং ঘটনা দিয়ে আমি শুধু প্রমাণ করার চেষ্টা করব যে—

পশুরাজ যেমন কেশর ফুলিয়ে শিকারের ওপর থাবা চালায়, ঠিক তেমনি ভঙ্গিতেই সুরেন ভাদুড়ি আসামীর কাঠগড়ার দিকে হঠাৎ তর্জনি বাড়িয়ে গর্জন করে উঠলেন, ওই আসামী কুন্তল চ্যাটার্জিই ফ্রী স্কুল স্ট্রীট হত্যাকাণ্ডের নায়ক—নিহত শোভা ইম্যানুয়েলের প্রকৃত খুনী!

একঝাঁক তীরের মত বহু চোখের দৃষ্টি এসে বিঁধল কুন্তলের সর্বাঙ্গে। গুন্ গুন্ গুঞ্জন উঠল আদালত-ঘরে। হাতুড়ি ঠুকে জজসাহেব বলে উঠলেন, অর্ডার! অর্ডার!

কাঠগড়ার রেলিংটা শক্ত করে চেপে ধরলে কুন্তল। পাবলিক প্রসিকিউ-টরের গর্জন, আদালত-ঘরের গুন্‌গুন্‌ আর জজসাহেবের 'অর্ডার-অর্ডার' ধ্বনি যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছিল তার কানে। কুন্তলের মনে হল তার সর্বাঙ্গে গভীর ঘুমের মত একটা ক্লান্তি নামছে। একটা বালিশ পেলে বুঝি-বা এখুনি ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

এর পর শুরু হল জেরা।

ডাকা হল যমুনা লালাকে। বুড়ো হ্যারি সাহেবের পাশে বসে এতক্ষণ সে শুনছিল। আস্তে আস্তে সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। কালো গাউন ঝুলিয়ে সুরেন ভাদুড়ি গিয়ে দাঁড়ালেন পাশে। ভগবানের নামে সত্য বলার শপথ গ্রহণ করলে যমুনা।

কতকগুলি মামুলি প্রশ্নোত্তরের পর সুরেন ভাদুড়ি বললেন, ঘটনার রাতে সিঁড়ি দিয়ে যাকে আপনি পালাতে দেখেছিলেন, আসামী কি সেই লোক?

আসামীর কাঠগড়ার দিকে তাকিয়ে যমুনা স্থির স্বরে জবাব দিলে, তাই মনে হয়।

মনে হওয়ার কারণ কি?

পালাবার সময় আততায়ীর গায়ে সবুজ-চেক টুইডের যে কোট আর লাল টাই ছিল, পরদিন ইণ্ডিয়া ব্যাঙ্কে আসামীর গায়েও ঠিক তাই দেখেছিলাম।

এইটাই কি একমাত্র কারণ?

না। আসামীর পিঠ আততায়ীর পিঠের মতই চওড়া। তাছাড়া, লম্বায়, শরীরের গড়নে, এমন কি চুলের ধাঁচেও দুজনের মধ্যে হুবহু সাদৃশ্য।

সুরেন ভাদুড়ির ছাঁটা গোঁফের নিচে বিজয়ীর অহংকার ঝিলিক দিয়ে উঠল। এজলাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, কথাটা লক্ষ্য করুন, ইওর অনার। লম্বায়, শরীরের গড়নে, এমন কি চুলের ধাঁচেও আসামী এবং আততায়ীর মধ্যে হুবহু সাদৃশ্য। এই সাদৃশ্য দেখেছেন কে? যিনি নিহতা শোভা ইম্যানুয়েলের পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশিনী এবং ঘটনার সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান সাক্ষী। সেই হিসেবে আলোচ্য মামলায় মিস যমুনা লালার এই কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয় কি?

তারপর আবার প্রথম সাক্ষীর দিকে ফিরে পি, পি. বললেন, আর আমার কোন প্রশ্ন নেই, মিস লালা। ধন্যবাদ।

সাক্ষীর ডকে দ্বিতীয় সাক্ষী উঠল। বৃদ্ধ এক পাঞ্জাবী। চুল-দাড়ি-গোঁফ সব 'ক্রীসমাস বুড়োর' মত ধবধবে।

পি. পি. প্রশ্ন করলেন, W,B.T, 9001 নম্বর ট্যাক্সি কে চালায় সর্দারজী?

সাক্ষীর ডক থেকে জবাব এল, জী, আমি।

দিনে চালাও, না রাতে?

রাতে। দিনে আমার ছেলে চালায়।

কত রাত অবধি ভাড়া খাটো?

বারোটা-একটা অবধি হুজুর।

আচ্ছা, গত ১০ই ফেব্রুয়ারী রাতে গাড়ি বের করেছিলে কি?

করেছিলাম।

রাত বারোটা নাগাদ কোনো সওয়ারী পেয়েছিলে?

পেয়েছিলাম।

কোথা থেকে কেমন করে পেয়েছিলে, মনে আছে?

জী, মনে আছে।

ঘটনাটা বলো তো। ভাল করে স্মরণ করে বলো।

পার্ক সার্কাসে এক সাহেবকে পৌঁছে দিয়ে আমি চৌরঙ্গীর দিকে ফিরছিলাম। লোয়ার সার্কুলার রোডের মোড ছাড়িয়ে পার্ক ষ্ট্রীটে ঢুকতেই হঠাৎ কে যেন আমায় ডাকলে। কুয়াশার রাত ছিল বলে ভাল করে নজর চলে নি। আওয়াজটা যেদিকে থেকে এল, সেই দিকে গাড়ি ব্যাক করে নিয়ে যেতেই দেখি, রাস্তার ধারে আর একখানা ট্যাক্সি থেকে এক জোয়ান ছোকরা নেমে আসছে। পরনে সাহেবী পোশাক। আমার গাড়িতে উঠে বসতেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, ও ট্যাক্সিখানা ছেড়ে দিলেন কেন? ছোকরা জবাব দিলে, ওর পেট্রল ফুরিয়ে এসেছে। তারপর আমাকে বললে, জলদি চালাও—যত জলদি পারো।

সওয়ারীকে কোথায় পৌঁছে দিলে?

টালিগঞ্জের এক বাগান-বাড়িতে হুজুর। শুনলাম সেখানে বায়োস্কোপ হয়।

আচ্ছা সর্দারজী সে-রাতের সওয়ারীকে তোমার মনে আছে?

কিছুটা মনে আছে বৈকি!

সুখের লাগিয়া

কালো গাউন দুলিয়ে, ছবি বিশ্বাসের ভঙ্গিতে পি. পি. এগিয়ে গেলেন আসামীর ডকের সামনে। যেখানে রেলিংটা শক্ত হাতে চেপে ধরে একট মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল কুন্তল।

এই আসামীর দিকে তাকাও সর্দারজী—ভালো করে দেখো। এবার বলো তো, সেদিন রাতের পার্ক ষ্ট্রীটের সেই সওয়ারী কি এই লোক?

ধবধবে ভুরুর তলা দিয়ে বুড়ো সর্দার চোখ দুটো কুঁচকে একবার তাকাল কুন্তলের দিকে। তারপর ঘাড় নেড়ে বললে, তাই তো মালুম হচ্ছে হুজুর! হুঁ, এমনি জোয়ান চেহারা, এমনি কাঁচা উমর!

ছাঁটা গোঁফের তলায় আবার বিজয়ীর হাসি নিয়ে সুরেন ভাদুড়ি তাকালেন এজলাসের দিকে। তারপর দু নম্বর সাক্ষীকে বললেন, তুমি যেতে পারো সর্দারজী।

ডকে তৃতীয় সাক্ষী উঠল। বাণী চিত্রমের ব্যবস্থাপক বিপিন। তার দিকে অবজ্ঞাভরে তাকালেন সুরেন ভাদুড়ি। বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন করলেন, কি করা হয়?

অমায়িক হেসে বিপিন বললে, ম্যানেজ করি সার।

ভুরু কুঁচকে ভাদুড়ি বললেন, কি ম্যানেজ কর?

বিপিন বললে, আজ্ঞে শুটিং ম্যানেজ করতে হয়।

বটে! আচ্ছা বিপিন, গত ২৬শে মাঘ রাতে তুমি স্টুডিওতে হাজির ছিলে?

ছিলাম বৈকি। নইলে চাকরি নট হয়ে যাবে যে!

কি কাজ ছিল সেদিন রাতে?

আমাদের 'পুষ্পবাসর' ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক রেকর্ডিং ছিল।

'পুষ্পবাসর' ছবির মিউজিক ডিরেক্টর কে?

কাগজে সিনেমা-পেজ পড়েন না বুঝি? নাঃ, আপনি বড় ব্যাকওয়ার্ড সার!

একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল আদালত-ঘরে। জজ সাহেব একবার কাশলেন। আর, সুরেন ভাদুড়ি চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়ে উঠলেন, বাজে বকছো কেন?

থতমত খেয়ে বিপিন বললে, এই সেরেছে! চটে গেলেন নাকি? আপনার 'প্রেসার'টা একবার দেখাবেন সার!

চাপা হাসির ঢেউটা এবার আর চাপা রইল না। জজ সাহেব আবার কাশলেন। আর আরক্ত মুখে সুরেন ভাদুড়ি গর্জন করলেন, ফের বাজে কথা! বল কে মিউজিক ডিরেক্টর?

কুন্তল চ্যাটার্জি।

রেকর্ডিং প্রোগ্রাম ক'টায় ছিল?

রাত এগারোটা থেকে।

আসামী কুন্তল চ্যাটার্জি কখন স্টুডিওতে গিয়েছিলেন?

রাত দেড়টা নাগাদ ট্যাক্সি করে যান।

তিনি কি বরাবরই এত লেট করে স্টুডিওতে যেতেন?

না সার। বরং দশ মিনিট আগে যেতেন, তবু এক মিনিট দেরি হত না কখনো। কেবল সেদিন তাঁকে প্রথম লেট হতে দেখলাম।

পাবলিক প্রসিকিউটরের মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। জজ সাহেবের দিকে গ্রীবাভঙ্গি করে বললেন, ইওর অনার, তিন নম্বর সাক্ষীর শেষ কথাগুলো লক্ষ্য করবার মত।—আচ্ছা, তুমি যেতে পার বিপিন।

বাঁচালেন সার।

এক লাফে সাক্ষীর কাঠগড়া থেকে নেমে গেল বিপিন।

জজসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আর কোন সাক্ষী?

প্রসন্ন মুখে পি, পি, বললেন, ইওর অনার, আসামীর অপরাধ প্রমাণের জন্য মাত্র তিনটি সাক্ষীর বিবৃতিই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আদালতের মূল্যবান সময় আর নিতে চাই না, কেবল আসামীকে একটিমাত্র প্রশ্ন করেই আমি আমার জেরা শেষ করব।

বীরদর্পে সুরেন ভাদুড়ি এগিয়ে গেলেন আসামীর কাঠগড়ার সামনে। ঘাল হয়ে আসা শিকারের প্রতি শিকারী পশু যেমন পরিতৃপ্তির সঙ্গে তাকায়, তেমনি করে তাকালেন নিথর নিঃশব্দ কুন্তলের দিকে। তারপর প্রশ্ন করলেন, আপনার স্ত্রী পুলিশের কাছে বলেছেন, ২৬শে মাঘ রাত সাড়ে দশটায় আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। আর, ব্যবস্থাপক বিপিন বলছে, আপনি স্টুডিওতে পৌঁছোন রাত দেড়টায়। সাড়ে দশটা থেকে দেড়টা অবধি আপনি কোথায় ছিলেন?

কোন জবাব এল না আসামীর ডক থেকে।

বলুন—জবাব দিন আমার প্রশ্নের—

কুন্তল তেমনি নিথর নিঃশব্দ।

আবার বললেন ভাদুড়ি, বলুন, কোথায় ছিলেন ?

হঠাৎ নড়ে উঠল নিস্পন্দ একটা মূর্তি। কলের পুতুলের মত ঠোঁট নেড়ে কুন্তল বললে, মনে পড়ছে না।

গর্জন করে উঠলেন ভাদুড়ি, মনে করে বলুন—কোথায় ছিলেন ২৬শে মাঘ রাত বারোটাব সময় ? কোন আত্মীয়ের বাড়ি ?

না।

কোন বন্ধুব কাছে ?

না।

কোন গানের আসরে ?

না।

তবে ? (ভাদুড়ির গলা আব এক ধাপ চড়ল) সত্য গোপন করবেন না—২৬শে মাঘ রাত বারোটায় কোথায় ছিলেন বলুন ?

ঝুঁকে পড়া মাথাটা তুলে, সোজা হয়ে দাঁড়াল কুন্তল। স্তিমিত দুই চোখে মরণাহত প্রাণীর মরীয়া দৃষ্টি ফুটে উঠল। তারপর পাবলিক প্রসিকিউটরের মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির কণ্ঠে উচ্চাবণ করলে, ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ফ্ল্যাট-বাড়িতে ছিলাম।

মুহূর্তে আদালত-ঘরটা কবরখানাব মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বিজয়ীর হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে সুরেন ভাদুড়ি বললেন, ইওর অনার, আমার জেরা শেষ হয়েছে।

আর, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জজসাহেব বললেন, মামলা মুলতুবী রইল।

★

সিগারেটটা নিভে গিয়েছে। তবু সেটাকে দাঁতে চেপে ব্যারিস্টার দত্তগুপ্ত বললেন, এর পরেও কি আপনি মামলা জেতার আশা রাখেন মিস্টার বোস?

প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুমের এধার থেকে ওধার অবধি স্বচের গেলাস হাতে পায়চারি করছে রমেন বোস। কোন কারণে বিচলিত হলে বা চিন্তার গভীরে ডুবে গেলে রমেন এক জায়গায় স্থির থাকে না। দত্তগুপ্তের সামনে এসে সে থামল, তারপর বললে, আমি মিসেস মিতালী চ্যাটার্জি হলে নিশ্চয় আশা রাখতাম গুপ্তসাহেব। যে-কোন খুনী আসামীর স্ত্রী তাই করে। আর তাদের আশা পূর্ণ করার চেষ্টাই আমাদের পেশা নয় কি?

লাইটার বের করে সিগারটা ধরাতে গিয়েও ধরালেন না দত্তগুপ্ত। সিগারের টুকরোটা বাঁ হাতের আঙুলে ধরে বলতে লাগলেন, রাইট। কিন্তু এক্ষেত্রে আশা করে লাভ কি? প্রত্যেকটি সাক্ষ্য-প্রমাণ কুন্তল চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে।—এক এক করে ধরুন, খুনের জায়গায় গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের প্যাকেট আর সোনালি রিবনের রিং পাওয়া গেছে। কুন্তলবাবুও গোল্ড ফ্লেক সিগারেট খান, প্যাকেটের রিবন নিয়ে রিং তৈরি করা তাঁর অভ্যেস। পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশিনী যমুনা তাঁকে পালাতে দেখেছে, হরদিৎ সিং ট্যাক্সি-ড্রাইভার তাঁকে খুনের ঠিক পরেই, অর্থাৎ রাত বারোটার সময় পার্কস্ট্রীটের কোণ থেকে গাড়িতে তুলেছে। সবচেয়ে মারাত্মক হয়েছে তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি—ঘটনার রাতে খুনের সময় তিনি ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ওই ম্যানসনেই ছিলেন।

রমেন বোস আবার পায়চারি শুরু করেছিল। প্রশ্ন করলে, কার কাছে, কি উদ্দেশ্যে ওই ম্যানসনে গিয়েছিল, সে বিষয়ে কুন্তল কিছু বলেছে আপনাকে?

না। আদালত থেকে বেরিয়ে তিনি সেই যে মুখ বন্ধ করেছেন, একবারও খোলেন নি। ব্যাপারটা রীতিমত রহস্যময়।

অন্যমনস্ক ভাবে রমেন শুধু বললে, হুঁ।

লাইটারটা বোধ করি খারাপ। বারকয়েক চেষ্টাতেও জ্বলল না। সেটা পকেটে রাখতে রাখতে দত্তগুপ্ত বললেন, শুনেছি, আপনি আর কুন্তলবাবু একসময় কলেজে সহপাঠী ছিলেন। সেই পুরাতন বন্ধুত্বের সূত্র ধরে কুন্তল-রহস্য ভেদ করা হয়তো আপনার পক্ষেই সম্ভব হতে পারে। আমি বলি কি, কেসটা আপনি নিজের হাতে নিলেই ভালো করতেন মিস্টার বোস।

রমেন তখন পূর্ণ গেলাস শূন্য করছিল। বললে, ক্ষেপেছেন, গুপ্তসাহেব? আমি কেস নেব! মরা ঘোড়া কখনো ঘাস খায়?

গুপ্তসাহেব হেসে উঠলেন: কিন্তু হুইস্কি যে খায়, তা স্বচক্ষে দেখছি। সুতরাং মরা বলি কি করে?

তারপর রিস্টওয়াচের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, উঠি আজ।

দত্তগুপ্তের সঙ্গে সঙ্গে রমেন বেরিয়ে এল বাইরের বাগানে। গাড়িতে ওঠার আগে দত্তগুপ্ত বললেন, জোক্‌স্ য়্যাপার্ট, আবার বলছি, এখনো সময় আছে, কেসটা আপনি নিন। আমার ওপর ভরসা রাখবেন না।

মানে?

জানেনই তো গ্যাসটিক আল্‌সারের রুগী আমি। ক'দিন থেকে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না।

রমেন হেসে বললে, চল্লিশ পেরোলে সকলেরই শরীর নোটিশ দেয়! তাই বলে ঘাবড়ালে কি চলে?—গুডনাউট।

গুডনাইট।

দত্তগুপ্তের গাড়ি বেরিয়ে গেল। রমেন কিন্তু ভেতরে গেল না, অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেই জঙ্গলে-ভরা বাগানে। সত্যি, কুন্তলের কেসটা বড় জটিল হয়ে উঠেছে। তার চেয়েও জটিল হয়ে উঠেছে কুন্তল নিজে। কেন সে আদালতের সামনে ওই স্বীকারোক্তি করতে গেল—বিপদে পড়বে জেনেও? আর, গিয়েছিলই যদি অত রাতে ওই বিদ্‌ঘুটে ম্যানসনে, তবে কার কাছে কি মোটিভ নিয়ে গিয়েছিল, সে-কথাই বা গোপন করছে কেন? সবার আগে ওই স্বীকারোক্তির জট খোলা দরকার।

কুন্তলের সঙ্গে দেখা করলে মন্দ হয় না। চিনতে পারবে কি দশ বছর বাদে? দেখাই যাক না।

কিন্তু কেন? কুন্তল চ্যাটার্জিকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কি দরকার তার? সে রমেন বোস, ওরফে মাতাল বোস, আইন-আদালতের ধার ধারে না, দিনান্তে একটু স্কচ পেলেই খুশি, তার এত গরজ কেন কুন্তল চাটুয্যের মামলা নিয়ে? কেন আবার! ঢাকের বাদ্যি শুনলেই চড়ুকে পিঠ সুড়সুড় করে। তেমনি মামলার গন্ধ পেলেই উকিল-ব্যারিস্টারের গা চুলকায়।

কিন্তু হাস্‌নাহেনার গন্ধে রোমাঞ্চিত এই অন্ধকারের ভেতর থেকে কে যেন হঠাৎ বলে উঠল, কাকে ফাঁকি দিচ্ছো রমেন বোস? কে কুন্তল চাটুয্যে, তার মামলার জন্যে তোমার দায় পড়েছে। তোমার আসল দায় মিতালি—তোমার মরা প্রেমকে যে কবর খুঁড়ে আবার বাঁচিয়েছে! যাকে তুমি এখনও ভালোবাসো।

বোগাস! রমেন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল: ও-সব বাজে ব্যাপারে আমি নেই।

হঠাৎ তার চিন্তার খেই গেল ছিঁড়ে। একটা চমৎকার অর্কেস্ট্রার বাজনা ভেসে এল প্রথম ফাল্গুনের হাওয়ায়। আশেপাশে কোথায় যেন গ্রামোফোন রেকর্ড বাজছে। রমেনের মনে পড়ে গেল—এমনি হঠাৎই মনে পড়ে গেল—শোভা ইম্যানুয়েল খুন হবার সময় তার ঘরেও একখানা রেকর্ড বাজছিল। জ্যাক্ ষ্টিফেনের সিম্‌ফনী অর্কেষ্ট্রা।

★

বিকেল থেকেই দীপু বায়না ধরেছে, 'রাণুমাসির বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে যাব।' মিতালী কান দেয় নি। কিন্তু সন্ধ্যের পর তার বায়না আদুরে কান্নার পর্যায়ে উঠল। ঠাকুরকে রাতের রান্না বুঝিয়ে দিতে দিতে, মিতালী দীপুর একঘেয়ে কান্না শুনতে পেল : 'ওরে আমি রাণুমাসির বিয়েতে যাব রে। ওরে আমি নেমন্তন্ন খাব রে।'

রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরে এসে দাঁড়াল মিতালী।

এই, চুপ কর।

কোঁকড়া চুলের গোছা দুলিয়ে দীপু বললে, আগে রাণুমাসির বিয়েতে চল, তবে চুপ করব।

না, আমাদের যেতে নেই।

কেন যেতে নেই? আমাদের তো নেমন্তন্নর চিঠি পাঠিয়েছে।

পাঠাক্। তবু আমাদের যেতে নেই। আমরা যাব না।

দীপু তৎক্ষণাৎ আবার সুর ধরলে, ওরে আমি রাণুমাসির বিয়েতে—ইত্যাদি

বাইরের অন্ধকার বারান্দায় ভূতের মত চুপ করে বসেছিল কুন্তল। আলো জ্বালে নি। বাড়ি থেকে বেরুনো আজকাল প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। সারাটা দিন বহুবার পড়া বইগুলো আবার ওল্টায়, নয়তো চুপচাপ কি যেন ভাবে। গভীর রাতে কখনো ঘুম ভেঙে গেলে মিতালী দেখেছে, অন্ধকার বারান্দায় একা একা বিনিদ্র কুন্তল পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। প্রেসিডেন্সি জেলে সেই কালা-পানি-যাত্রী 'দায়মলি'দের মত।

দীপুর কান্না শুনে কুন্তল উঠে ঘরে এসে দাঁড়াল। অসীম বিরক্তিতে মিতালী তখন দীপুর কান ধরে ধমকাচ্ছে, চুপ কর্ বলছি—চুপ কর্—

কুন্তল আস্তে আস্তে বললে, দীপু নেমন্তন্ন খেতে ভালোবাসে, রাণুদের ওখানে গেলেই তো হয়।

দীপুর কান ছেড়ে দিয়ে, মিতালী সংক্ষেপে জবাব দিল, না।

গেলে ক্ষতিটা কি? রাণু তোমার খুড়তুতো বোন, সামাজিকতার দিক থেকেও—

কি এক মর্মান্তিক জ্বালায় মিতালীর দুই চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠল। ধাতব গলায় বললে, কোন্ মুখে বলছ শুনি? বিয়ে-বাড়িতে যাব দশজনের টিটকিরি শুনতে? আমাদের আবার সামাজিকতা কি? আমরা সমাজের বাইরে, আমরা হাড়ি-মুচিরও অধম!

আগুনের হল্কার মত মিতালী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। বাপ-মায়ের কথা-কাটাকাটিতে ঘাবড়ে গিয়ে দীপু কিছুক্ষণ থেমেছিল, মা চলে যেতেই সানাইয়ের পোঁ ধরার মত সেও ছেড়ে দেওয়া সুর তেড়ে ধরলে, ওরে আমি ইত্যাদি।

নিমেষে কুন্তলের মাথার মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। আল্না থেকে টেনে নিল দীপুরই প্যাণ্টের বেল্ট। তারপর সপাং করে একটা আওয়াজ, আর একটা আর্ত-চিৎকার! দ্বিতীয় বার হাতখানা তুলতেই আর একটা হাত এসে বেল্ট চেপে ধরল।

'থাক। তোমার হাতের মার ও সইতে পারবে না—মরে যাবে।' চোখে-মুখে অপরিসীম ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা নিয়ে মিতালী চরম কথাটা উচ্চারণ করলে, 'খুনীর হাত কি না'!

কি বললে?—গলা চিরে চিৎকার করে উঠল কুন্তল। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে তার পায়ের তলায় মেঝেটা যেন দুলছে। অবশ হাত থেকে খসে পড়ল বেল্টটা। তারপর অসমছন্দে পা ফেলে ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অন্ধকার বারান্দায়—বারান্দা থেকে সিঁড়িতে—সিঁড়ি থেকে রাস্তায়—

মিতালী ডাকলে না।

* * * *

পথেরও শেষ নেই, চলারও শেষ নেই যেন। আকাশে একটি তারা থেকে অনেক তারা উঠল, তবু কুন্তল ঘুরছে পথে পথে। খুনীর হাত! যে-হাত একদা পিয়ানোর ওপর বিদ্যুৎলীলায় খেলে বেড়াতো। যে—হাতের সরু লম্বা আঙুল

দেখে মিতালী নিজেই বলেছিল, 'তোমার আঙুলগুলো মোজার্টের মত— টিপিক্যাল আর্টিস্টের হাত।' সেই শিল্পীর হাত সত্যই আজ খুনীর হাত হয়ে গেছে, নইলে দীপুর কচি গায়ে এ হাত আঘাত হানল কি করে ?

পথ চলতে চলতে কুন্তলের মনে হল, আশেপাশে সবাই যেন বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে তার দিকে, আর ফিস্‌ফিস্ করে বলছে, ওই দেখ খুনী !

সামনের দেয়ালে দৃষ্টি পড়তেই কুন্তল থম্‌কে গেল। বাণী চিত্রমের 'পুষ্পবাসর' ছবির একটা রঙীন পোস্টার। রক্তের মত লাল টকটকে হরফগুলো জ্বলছে— 'সুরশিল্পী কুন্তল চ্যাটার্জি'।

দেখতে দেখতে হঠাৎ 'সুরশিল্পী' কথাটা মিলিয়ে গিয়ে ফুটে উঠল 'খুনী'! হিংস্র হয়ে উঠল কুন্তলের চোখ দুটো। দু-পা এগিয়ে একটানে চড়চড় করে ছিঁড়ে ফেললে পোস্টারখানা। আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই তার ঘাড়ে কে যেন হাত রাখলে। সেই হাতে উষ্ণ বন্ধুতার স্পর্শ। কুন্তল মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই লোকটা হাসল। মিষ্টি প্রসন্ন হাসি। হেসে বলল, আরে বা! চিনতে পারছ না নাকি ? আমি রমেন বোস হে !

অবাক হয়ে চেয়ে রইল কুন্তল।

রমেন বললে, মনে পড়ে সেণ্টজেভিয়ার্সে সেই ফাদার জোশেফ, ডিবেটিং ক্লাবে তোমার-আমার সেই কথার লড়াই, গ্রীষ্মের ছুটির আগে সেই থিয়েটার— একবার 'য়্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটকে তুমি সাজলে রোজালিণ্ড আর আমি ওরল্যাণ্ডো। কি হে, ভুলে গেছো নাকি দোজ গ্রীণ ইয়ার্স অব আওয়ার লাইভস্ ?

ধীরে ধীরে মিলিয়ে আসতে লাগল কুন্তলের মুখের কুঞ্চন। নিভে এল দু-চোখের খরদ্যুতি। একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলে উদাস গলায় বললে, কিছুই ভুলিনি রমেন।

বহুদিন দেখা নেই, তোমার ওখানে যাব ভাবছিলাম। পথে দেখা হল, ভালোই হল। জরুরি কাজ নেই তো এখন ? চলো আমার ওখানে, বেশ জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাক। ট্যাক্সি !

কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে কুন্তলকে ট্যাক্সিতে তুলে নিলে রমেন।

চৌরঙ্গী দিয়ে যেতে যেতে রমেন হঠাৎ বলে উঠল, ড্রাইভার সাহেব, একটু বাঁয়ে রাখো। আমার র‍্যাশন নিতে হবে।

সুখের লাগিয়া

রাস্তার বাঁয়ে একটা স্টোর্স, বড় বড় করে সাইনবোর্ডে লেখা—ওয়াইন য়্যাণ্ড প্রভিসন। 'জাস্ট এ মিনিট' বলে রমেন নেমে গেল।

ব্রাউন পেপারে মোড়া একটা বোতল হাতে দোকান থেকে বেরোতেই, তার কানে ভেসে এল, 'শ্যারাবী যা—যা—যা।'

মনে মনে গানটার তারিফ করে এদিক-ওদিক তাকাতেই রমেন দেখলে, পাশেই একটা গ্রামোফোনের দোকান। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলে সে, তারপর ট্যাক্সি লক্ষ্য করে বললে, একবার নেমে আয় তো কুন্তল, দু-একটা রেকর্ড বেছে দিবি।

দোকানে ঢুকে রমেন বললে, বিলাতি রেকর্ড রাখেন ?

দোকানী সবিনয়ে নিবেদন করলে, আজ্ঞে রাখি।

কিছু অর্কেস্ট্রার রেকর্ড শোনান তো!

খান কয়েক রেকর্ড বাজাবার পর রমেন জিজ্ঞেস করলে, জ্যাক স্টিফেনের লেটেস্ট্র অর্কেস্টা আছে ?

ঘাড় নেড়ে দোকানী মেশিনে চাপাল জ্যাক স্টিফেনের সিমফনী অর্কেস্ট্রা। আর, রুদ্ধনিশ্বাসে রমেন দু চোখের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে চেয়ে রইল কুন্তলের মুখের পানে। কিন্তু এ কি দেখছে সে ? শান্ত সমাহিত মুখ, স্বপ্নগভীর দুই চোখ। জ্যোৎস্নারাতের সমুদ্রের মত উদ্বেলিত সুর-মূর্ছনায় ডুবে গেছে শিল্পীর আত্মা। রেকর্ড থামলে ধীরে ধীরে কুন্তল বললে, অপূর্ব! এইখানাই নাও।

ট্যাক্সিতে ফিরে এসে রমেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। যে ঘরে জ্যাক-স্টিফেনের অর্কেস্ট্রা বাজে, সেখানে আর যেই পারুক, কুন্তল চ্যাটার্জি খুন করতে পারে না কখনো। আইনের চোখে এটাকে হয়তো একটা বড় রকমের সাফাই হিসাবে খাড়া করা যায়। তবু মনে যেন জোর পাচ্ছে না রমেন। আসল রহস্যের কিনারা হল কই ? ২৬শে মাঘের সেই কুয়াশার রাতে কুন্তল কেন গিয়েছিল ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ম্যানসনে ? কেন ? কেন ? কেন ?

কুয়াশার রাত কি কাটবে না ?

* * * *

দুটি সিগারেট থেকে নীলচে ধোঁয়ার দুটি সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। ড্রয়িংরুমে সবুজ ঘেরাটোপে ঢাকা আলোর নিচে মুখোমুখি বসে আছে দুই বন্ধু।

ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের ম্যানসনে তুমি ঘটনার রাতে গিয়েছিলে, এ-কথা আদালতে স্বীকার করতে গেলে কেন কুন্তল ?

পারলাম না রমেন—মিথ্যে বলার চেষ্টা করেও সত্যটাই বেরিয়ে গেল।

রমেনের গলা সহৃদয়তায় কোমল হয়ে এল : তোমার মত একটা আর্টিস্টের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার স্বীকারোক্তি তোমারই বিপক্ষে কতখানি গেছে, তা বোঝ ?

বুঝি।

ওই বাড়িতে তুমি কি সে-রাতে প্রথম গিয়েছিলে ?

না। আগেও যেতাম।

আগেও যেতে ! (দুর্বার কৌতূহলে রমেনের দুই চোখ দীপ্ত হয়ে উঠল) কার কাছে কুন্তল ? নর্তকী শোভার কাছে ?

না। চোখেই দেখি নি তাকে।

তবে ? কেন যেতে, কার কাছে যেতে ?

কুন্তলের মুখে ছায়া পড়ল। বললে, ও-কথা জিজ্ঞেস কর না রমেন, জবাব দিতে পারব না।

ছায়া রমেনের মুখেও পড়ল। তবু কণ্ঠে আরো সহৃদয়তা এনে বললে, আমি তোর পুরনো বন্ধু, আমাকে বলতে বাধা কিসের ?

এতক্ষণ সহজ ভাবে কথা বলছিল কুন্তল, হঠাৎ মনে মনে শামুকের মত গুটিয়ে গেল। বললে, ও প্রশ্ন থাক।

'ছেলেমানুষী করিস নে কুন্তল।' রমেন উঠে এসে কুন্তলের পাশে বসল, 'মিতা আর দীপুর' মুখ চেয়ে বলতেই হবে তোকে। না বললে, প্রমাণ না দিলে আদালত বিশ্বাস করবে কেন যে, ঘটনার রাতে শোভা ইম্যানুয়েলের ঘরে তুই ছিলি না ? বল্ কার ঘরে ছিলি—কে সে ?

'না-না-না, বলতে পারব না আমি—বলার উপায় নেই।' কুন্তলের কঠিন মুখখানা লাল হয়ে উঠল এক অবরুদ্ধ আবেগে। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলে উঠল, তার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক ইজ্জৎ জড়িয়ে আছে রমেন—প্রকাশ হলে আমার স্বর্গগত বাবার নামে কলঙ্ক পড়বে।

তারপর হঠাৎ উঠে ঘরের বাইরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সে-রাতে ল্যান্সডাউন রোডের একটি বাড়ির ড্রয়িংরুমে ভোর অবধি বাতি জ্বলেছিল, আর চিন্তামগ্ন একটি মানুষের অস্থির পদচারণার বিরাম ছিল না।

অনেক সিগারেট ছাই হল। নিঃশেষ হয়ে গেল স্কচের পুরো বোতল। রমেন বোসের চিন্তা তবু শেষ হল না। সারারাত ধরে সে ভেবেছে কুন্তলের শেষ কথাগুলো : 'তার সঙ্গে আমাদের পারিবারিক ইজ্জৎ জড়িয়ে আছে—প্রকাশ হলে আমার স্বর্গগত বাবার নামে কলঙ্ক পড়বে !'

এতখানি আশ্চর্য রমেন জীবনে হয় নি। কেননা, কুন্তলের পরলোকগত বাবা অধ্যাপক কমলেশ চাটুয্যেকে সে ব্যক্তিগত ভাবেই জানত। সেন্ট-জেভিয়ার্স থেকে রিপনে এসে সে তাঁর ছাত্র হয়েছিল দু-বছর। সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে কমলেশ চাটুয্যের যতটা খ্যাতি ছিল, নৈতিক আদর্শের দিক দিয়েও তাঁর সুনাম ছিল ততখানি। কিন্তু কি এমন ঘটেছিল তাঁর মত মানুষের জীবনে, যার কলঙ্কিত ইতিবৃত্ত সারাজীবন ধরে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে তাঁর ছেলে ? এমন কে আছে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের সেই ফ্ল্যাট-বাড়িটায়, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে চাটুয্যে-পরিবারের ইজ্জৎ ? যার পরিচয় প্রকাশ পেলে কলঙ্ক পড়বে স্বর্গগত কমলেশ চাটুয্যের মত আদর্শবাদীর নামে ? কে সে ? জানা কি এতই অসম্ভব ?

অদ্ভুত জেদ ওই ইডিয়ট কুন্তলটার। কিছুতেই বললে না। ঠিক আছে, জেদ রমেন বোসেরও কম নয়। শেষ অবধি সে চেষ্টা করে দেখবে রহস্যভেদ করা যায় কিনা। ভাগ্যের কাছে শেষ সুযোগ চেয়ে নেবে খুনী আসামী কুন্তল চ্যাটার্জিকে বাঁচিয়ে, মিতালীর মুখে হাসি ফোটাবার।

হ্যাঙার থেকে কোটটা নিয়ে কাঁধে ফেলল রমেন। জানালা দিয়ে সকালের রোদ এসে লুটিয়ে পড়েছে ঘরের মেঝেয়। সারারাত জেগে মাতালেরও দু-চোখ জ্বালা করছে। তা হোক, এখুনি যেতে হবে। সময় নেই। আগামী কাল কুন্তলের বিচারের শেষ দিন।

★

শুধু পাঁচ টাকার একখানা নোট। তাতেই কাজ হবে রমেন জানত। দুনিয়াটা কার বশ ? দুনিয়া টাকার বশ।

ফ্ল্যাট ভাড়ার সন্ধানে এসেছি বলায় রমেনকে দারোয়ান প্রথমে হাঁকিয়েই দিতে চেয়েছিল, 'না, একভি কামরা খালি নেই এ বাড়িতে। সতোবোটা ফেলাট, সব ভর্তি।' তারপর নোটখানা হাতে পেয়ে সুর বদলে গেল, হ্যাঁ, খালি আছে একটা—তিনতলায় ওই পচ্ছিম দিকে। লেকিন বাবুসাব, আজকাল ভারি কড়াকড়ি হয়েছে ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে।

কেন দারোয়ানজী ?

এপাশে ওপাশে তাকিয়ে চুপি চুপি দারোয়ান বললে, চারতলায় সেদিন একটা নাচওয়ালী খুন হয়েছে।

তাই নাকি ? -রমেন যেন ভয়ানক ঘাবড়ে গেল : বাড়িটা তাহলে ভালো নয় বলো ?

না, না, বাড়ি খারাপ নয় বাবুসাব। তবে অমন দু-একটা খারাপি হয়েই থাকে ফেলাট-বাড়িতে।

ভাড়াটেরা লোক কেমন ?

বিলকুল ভদ্দর আদমি !

সবাই ফিরিঙ্গি নাকি ? না, অন্য জাত আছে ?

সবরকম আছে বাবুসাব—এ বাড়িটা মানুষের চিড়িয়াখানা। এই ধরুন চারতলায় থাকে ব্যাঙ্কের হিন্দুস্থানী মেমসাহেব, তিনতলায় জুতাওয়ালা চীনা আর তামাক ওয়ালা সিন্ধি, দু-তলায় অফসর মাদ্রাজী আর ফলওয়ালা পাঞ্জাবী—

মনে মনে রমেন বলে উঠল, চুলোয় যাক চীনা সিন্ধি মাদ্রাজী পাঞ্জাবী। তারপর উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কোন বাঙালি নেই।

জরুর আছে। দোতলার ন' নম্বর ফেলাটে এক বুঢ্‌ঢি বাঈ থাকে আর তার লেড়কা।

বটে! এক বুড়ি মহিলা আর তার ছেলে! কত বয়েস ছেলের ? কি করে ?

সুখের লাগিয়া

দারোয়ানের চোখে সংশয় দেখা দিল: এত খবরে আপনার কাজ কি বাবুসাব ?

রমেন সামলে নিলে, বাঙালি কিনা, তাই খোঁজ নিচ্ছি।

পাগড়িটা জুৎ করে বাঁধতে বাঁধতে দারোয়ান বললে, কাল আইয়ে বাবুসাব। আমায় এখন মালিকের অফিসে যেতে হবে ভাড়ার রসিদ আনতে। কুছু ভাববেন না, ফেলাট আপনাকে জরুর পাইয়ে দেব, লেকিন হামার দস্তুরীটা—

হেসে গোঁফ চুমরে দারোয়ান রাস্তায় নেমে গেল, আর ফ্রী স্কুল স্ট্রীটের সতেরো ফ্ল্যাটওয়ালা সেই প্রকাণ্ড ম্যানসনের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল রমেন। কি করবে সে এখন ? ভাগ্যের কাছে শেষ সুযোগ নেবে ? দেখাই যাক না অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লে কোথায় গিয়ে লাগে।

সামনেই সিঁড়ি। উঠে গেল রমেন। ন-নম্বর ফ্ল্যাটের দরজা খুঁজে নিতে বেশি দেরি হল না। আস্তে আস্তে টোকা দিলে কয়েকটা। একটু পরেই অল্প ফাঁক হয়ে গেল দরজার কপাট দুটো। দেখা গেল শাদা শাড়িপরা নিরাভরণা একটি বয়স্কা মহিলাকে। বৃদ্ধা না বলে প্রৌঢ়া বলাই উচিত। মাথার চুলে সবে রূপালি ছাপ লেগেছে, রোগক্লিষ্টা হলেও চামড়া এখনো লোল হয় নি। শান্ত সংযত চেহারা তবু অত্যন্ত গৌরবর্ণ শীর্ণ মুখের রেখায়, ঘন-কালো টানা চোখের কালিপড়া কোলে, পাৎলা লালচে ঠোঁটের বঙ্কিমায় বিগত রূপ-যৌবনের কয়েক পৃষ্ঠা ইতিহাস যেন পড়তে পারলে রমেন।

কে ?

আমি কুন্তল চ্যাটার্জির কাছ থেকে এসেছি।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন মহিলা। তারপর আশ্চর্যরকম মিষ্টি গলায় বললেন, চিনতে পারলাম না তো !

চিনতে পারলেন না। প্রফেসর কমলেশ চ্যাটার্জির ছেলে কুন্তল।—প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলে রমেন।

চলন্ত একটুকরো মেঘ সরে গেল কি মহিলার মুখের ওপর দিয়ে ? না রমেনের চোখের ভুল ?

তেমনি শান্ত মধুর স্বরে মহিলাটি বললেন, তোমার বোধ হয় ভুল হয়েছে বাবা।

সুখের লাগিয়া

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কথা হারিয়ে গেল তার। ভুল! সত্যিই কি ভুল হল তার জীবনের অঙ্ক কষায়? উত্তর তো মিলছে না!

দরজা বন্ধ করার জন্যে কপাটে হাত দিলেন মহিলা। হঠাৎ আবেগের সঙ্গে বলে উঠল রমেন, আগামী কাল কুন্তলের ফাঁসির হুকুম হবে। তাই তার শেষ কথাটা জানতে এসেছিলাম। ভুল হয়ে থাকলে, আমায় মাপ করবেন।

ছোট্ট একটা নমস্কার করে, রমেন সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই পেছন থেকে সেই আশ্চর্য মিষ্টি গলার ডাক এল, শোনো।

ফিরে তাকাল রমেন। কি এক রুদ্ধ ব্যাকুলতায় মহিলাটির মুখের রেখাগুলি কাঁপছে।

ভেতরে এসো।

যেন সকালের রোদ লেগে ঝল্‌মলিয়ে উঠল রমেনের রাতজাগা ক্লান্ত মুখ। না, ভুল হয় নি জীবনের অঙ্কে। মিলেছে উত্তর।

চৌকাঠ পার হয়ে ভেতরে পা দিতেই মহিলা বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও বাবা। তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলতে চাই।

* * * *

ন-নম্বর ফ্ল্যাট থেকে রমেন যখন বেরিয়ে এল, তখন দুপুর। পার্ক স্ট্রীট ধরে শিস্‌ দিতে দিতে চলল সে। খুসি হলে সে শিস্‌ দেয়।

কাজ এখনো একটু বাকি আছে। য়্যাটর্নি সেন য়্যাণ্ড রায়ের অফিসে গিয়ে আজকের এই চমকপ্রদ খবরটা জানানো। ব্যাস, তা হলেই ছুটি।

কিন্তু আরেকটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল রমেন বোসের জন্য। য়্যাটর্নির অফিসে পৌঁছতেই, সিনিয়ার পার্টনার সেন প্রায় লাফিয়ে উঠলেন: কোথায় ছিলে হে বোস? সকাল থেকে পাঁচ-পাঁচবার ফোন করেছি তোমাকে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে রমেন বললে, কেন? কি ব্যাপার?

আর ব্যাপার! মিস্টার দত্তগুপ্ত হাসপাতালে।

হাসপাতালে মানে?

ক'দিন থেকেই ভীষণ পেটের যন্ত্রণা হচ্ছিল, আজ সকালে অপারেশন হয়েছে।

সুখের লাগিয়া

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল রমেন, মাই গড! কাল যে কুন্তলের কেস —লাস্ট ডে। উপায়?

সেন বললেন, উপায় আর কি! কোর্টের অনুমতি নিয়ে রেখেছি, দত্তগুপ্তের বদলে কাল কোর্টে তুমিই য়্যাপিয়ার কর।

আমি!—রমেনকে হঠাৎ যেন বিছে কামড়ালো। তারপর চেয়ারে হাত-পা এলিয়ে দিয়ে বললে, গুপ্তসাহেব এমনি করে জব্দ করল আমায়!

সেন বললেন, কেস তো তোমার জানাই আছে। তবু সন্ধ্যেবেলা কাগজপত্র নিয়ে দত্তগুপ্তের জুনিয়ার যাবে তোমার বাড়িতে।

গম্ভীর মুখে রমেন বললে, না গেলেই বাধিত হবো। সন্ধ্যের পর আমি একটু দাম্পত্য-কর্তব্য সারি।

দাম্পত্য-কর্ত্তব্য! সেনের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল, বিয়ে করেছ নাকি হে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। লাভ ম্যারেজ।

বটে! বটে! কার সঙ্গে?

নির্বিকার ভাবে রমেন জবাব দিলে, স্কটল্যাণ্ডের ভাটিখানার সঙ্গে।

অফিস-ঘর কেঁপে উঠল সেনের অট্টহাসিতে। রমেন একখানা শ্লিপ টেনে নিয়ে খস্‌খস্‌ করে একটা নাম লিখল। সেখানা সেনের হাতে দিয়ে বললে, কাল যেন এই নতুন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় সেন-সাহেব। চলি।

কিন্তু চলে যেতে গিয়েও ফিরে এল রমেন। ব্যস্ত হয়ে বললে, ভয়ানক ভুল হয়ে গেছে—র‍্যাশন কেনা হয় নি। গোটাকতক টাকা হবে?

একখানা বড় নোট বের করে সেন বললেন, তা হবে। কিন্তু কাল কোর্টে ঠিক সময়ে দেখা হবে কি?

নোটখানা পকেটে পুরে রমেন বললে, বাই স্কচ, সিওর।

রমেন চলে গেলে মিঃ সেন ভুরু কুঁচকে শ্লিপখানার দিকে তাকালেন। নতুন সাক্ষীর নাম লেখা রয়েছে—

সন্ধ্যামালতী দেবী

ফ্রী স্কুল স্ট্রীট ম্যানসন

ফ্ল্যাট-৯

★

ধীরে ধীরে সাক্ষীর ডকে উঠলেন নতুন সাক্ষী। শাদা শাড়ির কালো পাড় ঘিরে আছে তাঁর অত্যন্ত গৌরবর্ণ বিষণ্ণ মুখটিকে। টানা চোখ দুটি রক্তাভ, অল্প ফোলা।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ভূত-দেখার মত চমকে উঠল কুন্তল। বিবর্ণ হয়ে গেল মুখ। চিৎকার করে বলতে গেল, 'যাও তুমি, যাও,' আওয়াজ বেরুল না গলা দিয়ে।

কালো গাউন দুলিয়ে, সিংহের মত রাজকীয় ভঙ্গিতে পাবলিক প্রসিকিউটর স্বরেন ভাদুড়ি এগিয়ে গেলেন নতুন সাক্ষীর কাছে। শপথ গ্রহণের পর শুরু হল জেরা।

আপনার নাম ?

অপূর্ব মধুর গলায় জবাব শোনা গেল, সন্ধ্যামালতী দেবী।

কোথায় থাকেন ?

ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট ম্যানসনের ন-নম্বর ফ্ল্যাটে।

ঘটনার রাতে কোথায় ছিলেন ?

আমার ঘরে।

জেগে ছিলেন ?

ছিলাম।

আচ্ছা, ঘটনার বিষয় কি জানেন বলুন তো ?

সন্ধ্যামালতী বলতে লাগলেন, তখন রাত বারোটা হবে। আমি অসুস্থ হয়ে শুয়েছিলাম ঘরে। হঠাৎ একটা আর্তচিৎকার শুনতে পাই, আর তারপরেই সিঁড়িতে জুতোর দ্রুত আওয়াজ। ভয়ানক একটা কিছু ঘটেছে আশঙ্কা করে আমি অসুস্থ অবস্থাতেও দরজা খুলে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

তাহলে আসামীকে আপনি পালাতে দেখেছেন নিশ্চয় ?

মৃদু অথচ অতি স্পষ্ট গলায় সন্ধ্যামালতী বললেন, না ! কুন্তল আমার ঘরেই ছিল। আমার জন্যে একটা কবিরাজী ওষুধ খলে মাড়ছিল তখন।

সুরেন ভাদুড়ির মোটা ভুরু জোড়া কুঁচকে সেকেণ্ড ব্রাকেট হয়ে গেল। কড়া পণ্ডিত মশায়ের মত কঠোর স্বরে তিনি ধমকে উঠলেন, কি বলছেন আপনি জানেন ?

সাক্ষীর ডক থেকে জবাব এল, জানি। যা সত্যি, তাই বলছি।

তাহলে আপনি বলতে চান যে, আসামী খুন করে নি ?

স্থির শান্ত গলায় সন্ধ্যামালতী বললেন, না।

এক মুহূর্তের জন্য নিশ্চুপ হয়েই আদালত-ঘর আবার গুঞ্জনে ভরে উঠল। কৌতূহলী দর্শকদের দৃষ্টির সামনে সন্ধ্যামালতী মাথার কাপড আরো একটু টেনে দিলেন ! আর আসামীর কাঠগড়া থেকে নিষ্পলক চোখে কুন্তল চেয়ে রইল তাঁর দিকে।

কিন্তু এত সহজে দমবার পাত্র নন সুরেন ভাদুড়ি। বহু ক্রিমিন্যাল কেস করে করে তিনি মামলা-বিশারদ হয়েছেন। ছাঁটা গোঁফের নিচে কুটিল হাসি হেসে তিনি প্রশ্ন করলেন নতুন সাক্ষীকে, আচ্ছা, সে-রাতে আসামী কুন্তল কতক্ষণ ছিল আপনার ঘরে ?

প্রায় ঘণ্টাখানেক।

তারপরে ?

স্টুডিওতে চলে যায়।

আসামী কুন্তল যখন আপনার ঘরে ছিল, তখন তার গায়ে কি ছিল বলতে পারেন ?

সবুজ রঙের গরম কোট।

আর টাই ? কি রঙের ছিল মনে আছে ?

লাল রঙের।

যেন বহুপ্রার্থিত কোন হারানো জিনিস খুঁজে পেয়েছেন, এমনি মুখের ভাব নিয়ে ভাদুড়ি এজলাসের দিকে তাকিয়ে পুনরুল্লেখ করলেন, সবুজ কোট, লাল টাই ! তারপর পাকা খেলোয়াড় যেমন কর্নার থেকে গোলে

বল যারে, তেমনি করেই প্রশ্ন করলেন, আসামী কুন্তল যদি না-ই খুন করে থাকে, তবে এ-কথাটা পুলিশকে বা আদালতকে এতদিন জানান নি কেন আপনি ?

সন্ধ্যামালতীর মুখখানা আরও ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। কোন কথা বেরোল না তাঁর মুখ দিয়ে।

বলুন, কি উদ্দেশ্যে কথাটা চেপে রেখেছিলেন ?

সন্ধ্যামালতী তবু নির্বাক।

বিজয়ী সিংহের মত গ্রীবাভঙ্গি করে ভাদুড়ি বললেন, ইওর অনার, সাক্ষীর কাছে আব কোন প্রশ্ন আমার নেই। শুধু মাননীয় জুরীদের কাছে আমার শেষ কথা বলতে চাই।

তারপর কালো গাউন দুলিয়ে তেমনি রাজকীয় ভঙ্গিতে জুরীদের বেঞ্চের দিকে এগোতে এগোতে বলতে লাগলেন, সাক্ষী সন্ধ্যামালতী দেবীর উক্তি কতখানি যথার্থ, তা আপনাদেরই বিচার করে দেখতে অনুরোধ করি। তাঁর সাক্ষ্য যেমন অসঙ্গতিপূর্ণ তেমনি অবিশ্বাস্য। আপনাদের স্মরণ থাকতে পরে, নিহতা শোভার প্রতিবেশী যমুনা লালা তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, সবুজ কোট আর লাল টাই পরে আসামীকে তিনি চারতলা থেকে স্বচক্ষে নেমে যেতে দেখেছেন। অথচ সন্ধ্যামালতী বলছেন, ঠিক সেই সময় আসামী ওই একই পোশাক পরে দোতলায় তাঁর ঘরে বসে 'খলে' ওষুধ মাড়ছিলেন। একই পোশাকে একই ব্যক্তির একই সময়ে দু-জায়গায় উপস্থিতিটা ভৌতিক ব্যাপার বলে মনে হয় নাকি ? তাছাড়া, সন্ধ্যামালতী বলেছেন, ঘটনার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আসামী কুন্তল ওই বাড়ি থেকে চলে যায়। তাঁর এ-কথাও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। কেননা, হত্যাকাণ্ডের ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যেই ওই ম্যানসনের সদরে কড়া পুলিশ-পাহারা মোতায়েন হয়ে যায়। সবুজ কোট, লাল টাই পরা কোনো লোককে তারা ঢুকতে বা বেরোতে দেখে নি। সন্ধ্যামালতী বলেছেন বটে, আসামী কুন্তল খুন করে নি, কিন্তু তাঁর এই উক্তির স্বপক্ষে কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণও দেখাতে পারেন নি ? তাছাড়া তিনি তাঁর এই সাক্ষ্য এতদিন কেন গোপন করেছিলেন,

সে-বিষয়ে তাঁর অদ্ভুত নীরবতা সন্দেহজনক নয় কি? এক্ষেত্রে সন্ধ্যা-মালতীর সাক্ষ্য-বিবৃতি সত্য না মিথ্যা দিয়ে তৈরি, তা আপনারাই বুঝে দেখুন।

এক সেকেণ্ড থামলেন সুরেন ভাদুড়ি। জুরীরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছে তাঁর বক্তৃতা। মনে মনে খুশি হয়ে গুরু-গম্ভীর আওয়াজে আবার তিনি শুরু করলেন, মাননীয় জুরীগণ, এই মামলার প্রথম দিনে আমি বলেছিলাম, পৃথিবীতে জঘন্যতম পাপ হচ্ছে নরহত্যা। আজও সেই কথাই বলছি। পূর্ববর্তী তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে পরিষ্কার ভাবে বোঝা গেছে যে, ছাব্বিশে মাঘ রাতে ফ্রী স্কুল স্ট্রীট ম্যানসনের নর্তকী শোভা ইম্যানুয়েলকে আসামী কুন্তল চ্যাটার্জিই খুন করে পালিয়ে ছিল। হত্যাকারী কুন্তল এবং নিহিতা শোভা—দুজনেই গানবাজনা জগতের লোক—সুতরাং দুজনের মধ্যে যোগাযোগ থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। অথচ আসামী কুন্তল চ্যাটার্জি সমাজে একজন ভদ্র সৎ-চরিত্র যুবক, একজন কৃতী সঙ্গীতশিল্পী বলে সুখ্যাত। এই ধরণের মুখোসধারী শয়তানেরাই সমাজের পরম শত্রু। সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুখচেয়ে ওই খুনী আসামীর কঠোর শাস্তি হওয়াই কি উচিত নয়? মাননীয় জুরীগণ, আজ ন্যায়ের তুলাদণ্ড হাতে আপনারা বিচারের আসনে বসেছেন। আপনাদের মহান দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

সার্কাসের খেলোয়াড় যেমন খেলা শেষে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানায়, তেমনি করে এজলাসের সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটর সুরেন ভাদুড়ি নিজের আসনে বসলেন। তাঁর গুরু-গম্ভীর স্বর গম্‌গম্‌ করতে লাগল আদালতকক্ষে।

জজসাহেব বললেন, এবার আসামী পক্ষের কাউন্সেল সাক্ষীদের জেরা করতে পারেন।

কিন্তু জেরা করবে কে? দেখা গেল ডিফেন্স কাউন্সিলের আসন শূন্য। গুন্‌গুন্‌ ধ্বনি উঠল দর্শক মহলে।

দত্তগুপ্তের জুনিয়ার উৎকণ্ঠায় এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কোথায় রমেন বোস? এটর্নি সেন প্রমাদ গুণলেন। রমেন বোস কি সত্যিই ডোবালে মামলাটা? কি ভুলই করেছেন তিনি গতকাল তার হাতে একশো টাকার নোটখানা দিয়ে! সাধে কি আর লোকে তাকে মাতাল বোস বলে!

সুখের লাগিয়া

জজসাহেব আবার বললেন একটু গলা চড়িয়ে, আসামীপক্ষ সমর্থনের জন্যে কেউ আছেন কি আদালতে ?

ইয়েস মি লর্ড !

আদালত-ঘরের ও-প্রান্ত থেকে একটা সুপরিচিত কণ্ঠের সাড়া ভেসে এল। উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকালেন জজসাহেব, তাকালেন সুরেন ভাদুড়ি, জুনিয়ার ব্যারিস্টার, এটর্নি, দর্শক-মণ্ডলী সবাই। দেখা গেল, দর্শকের ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে কালো গাউন পরা দীর্ঘাকার একটি অতি-পরিচিত মূর্তি। রমেন বোস !

এজলাসের সামনে এগিয়ে এসে স্মিত মুখে সহজ গলায় রমেন বোস বললে, আজকের এই বিচার-সভায় আমার আসার কথা নয় ! কিন্তু সুযোগ্য ডিফেন্স কাউন্সেল মিস্টার দত্তগুপ্ত হঠাৎ গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাকে আসতে হল। দুনিয়ায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই এবং ন্যায়ের পক্ষ সমর্থনের অধিকার সকলেরই আছে, ব্যারিস্টারের অধিকারের চেয়েও সর্ব মানুষের সেই অধিকার অনেক বড়। সেই বৃহত্তর অধিকার নিয়েই আমি আজ এখানে এসেছি।

মি লর্ড, জেন্টল্‌মেন অব দি জুরী, দর্শকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি এতক্ষণ পাবলিক প্রসিকিউটর মহোদয়ের ওজস্বিনী বক্তৃতার তারিফ করছিলাম। আমার বিশ্বাস, আদালতের বদলে তিনি রঙ্গমঞ্চে যোগ দিলে, বোধ করি শিশির ভাদুড়ির সমতুল্য শিল্পী হতে পারতেন। কিন্তু ব্যারিস্টারের আসল কাজ হল সত্যকে খুঁজে বার করা ! বহু প্রশ্ন, বহু জেরা, বহু তর্কেও আমার সহযোগী মিস্টার ভাদুড়ি সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁর সত্যানুসন্ধানে সাহায্য করবার জন্যেই আমি শুধু একটি সাক্ষীকেই জেরা করব। তিনি হলেন সন্ধ্যামালতী দেবী।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যামালতী আবার সাক্ষীর ডকে উঠলেন।

স্মিত মুখে রমেন বোস এগিয়ে গেল তাঁর সামনে। ধীরনম্র স্বরে প্রশ্ন করল, আপনি তো বিবাহিতা ?

সাক্ষীর ডক থেকে জবাব এল, হ্যাঁ।

স্বামী জীবিত ?

না।

আপনার স্বামীর নাম ?

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সন্ধ্যামালতী বললেন, হিন্দু স্ত্রীকে স্বামীর নাম মুখে আনতে নেই।

একটা প্যাড আর পেন্সিল এগিয়ে দিয়ে রমেন বললে, তাহলে লিখে দিন।

আমি লেখাপড়া জানি না।

মৃদু হাসলে রমেন বোস। তারপর পেন্সিলটা প্যাডের ওপর ঠুকতে ঠুকতে প্রশ্ন করলে, অধ্যাপক কমলেশ চ্যাটার্জিকে আপনি চিনতেন ?

পাথর হয়ে গেলেন সন্ধ্যামালতী। আর, আসামীর কাঠগড়া থেকে চিৎকার করে উঠল কুন্তল, না, না, চেনেন না—কোন দিনও চিনতেন না।

আদালত-ঘরে চাঞ্চল্য দেখা গেল! জজসাহেব হাতুড়ি ঠুকলেন, অর্ডার, অর্ডার!

রমেন বোস সন্ধ্যামালতীর একেবারে কাছে সরে গেলো। কোমল অন্তরঙ্গ সুরে বলতে লাগল, আপনারই জবাবের ওপর একটা মানুষের মরা-বাঁচা নির্ভর করছে। চুপ করে থাকবেন না—কাল আমাকে যা বলেছিলেন, তা যদি সত্য হয়, তবে বলুন, কমলেশ চ্যাটার্জি আপনার কে ?

আমার স্বামী।—সন্ধ্যামালতীর অপূর্ব মধুর গলা কেঁপে গেল।

কি ভাবে আপনাদের বিয়ে হয় ?

রেজিস্ট্রি করে।

হিন্দু মতে নারায়ণ আর অগ্নিসাক্ষী করে হয় নি কেন ?

আমি থিয়েটারের অভিনেত্রী ছিলাম, তিনি ছিলেন সমাজের মানী ব্যক্তি। তাই গোপনে আমাদের বিয়ে হয়েছিল।

শোনা যায়, কমলেশ চ্যাটার্জির আরেকটি স্ত্রী ছিলেন। কথাটা কি সত্য ?

সত্য। তিনিই হিন্দুমতে বিবাহিতা স্ত্রী।

পেন্সিলটা চিবুকে ঠেকিয়ে রমেন বললে, কুন্তল তাহলে কার ছেলে ? মানে, কোন্ স্ত্রীর গর্ভজাত ? আপনার ?

সন্ধ্যামালতী বললেন, না। আমার স্বামীর প্রথমা স্ত্রীর সন্তান।

আপনি তাহলে কুন্তলের বিমাতা ? আপনার কোন সন্তান আছে ?

একটি মাত্র ছেলে।

কত বড ?

কুন্তলের চেয়ে দু-বছরের ছোট।

দেখতে কেমন ?

কুন্তলেবই মত মাঝামাঝি লম্বা, দোহারা স্বাস্থ্যবান চেহাবা। তফাৎ শুধু বঙ আব মুখের গডনে।

এজলাসের দিকে ফিরে রমেন বলে উঠল, মি লর্ড, সাক্ষীর এই কথাগুলিই বিচারাধীন হত্যাবহস্তেব চাবিকাঠি।

তাবপর সন্ধ্যামালতীকে আবাব প্রশ্ন কবলে, আচ্ছা, কুন্তলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন ? সাধাবণত সৎ মায়ের সঙ্গে সতীনেব ছেলেব সম্পর্ক যেমন হয়, তেমনি ?

সন্ধ্যামালতী একবার তাকালেন আসামীর কাঠগডার দিকে। নিবিড় মমতায় স্নিগ্ধ হয়ে এল তাঁব মুখ। স্নেহ-সিক্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, না। কুন্তল আমার আপন সন্তানেরও অধিক। আমাব স্বামীর মৃত্যুব পর তাব সেবা, তার সাহায্য না পেলে আমি বাঁচতাম না।

কিন্তু কুন্তল যদি আপনার সন্তানের অধিক হয়, তবে তার এত বড বিপদে এতদিন আপনি চুপ করে ছিলেন কেন ? তদন্তেব সময় কেন পুলিশকে বলেন নি যে, খুনেব সময় কুন্তল আপনাবই ঘরে ছিল ?

ছলছলিয়ে এল ঘন কালো টানা চোখ দুটি। নতমুখে সন্ধ্যামালতী বললেন, তখন ভাবি নি যে ওব ফাঁসি অবধি হতে পারে।

আচ্ছা, সে-রাতে কুন্তল কখন চলে গিয়েছিল আপনার ঠিক মনে আছে কি ?

আছে। খুনের প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে।

সদবে পুলিশ-পাহারা এড়িয়ে গেল কি করে ?

সদর দিয়ে সে যায় নি। হাঙ্গামার ভয়ে আমি তাকে ধাঙড় আসা যাওয়ার ঘোবানো সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিলাম পাশের গলিতে।

স্মিত মুখে রমেন বোস বললে, আদালতের তরফ থেকে আপনাকে

অনেক ধন্যবাদ সন্ধ্যামালতী দেবী। আমার আর একটি মাত্র প্রশ্ন বাকি আছে। ঘটনার রাতে চিৎকার শুনে, আপনার ফ্ল্যাটের দরজা খুলে কাকে দেখতে পেয়েছিলেন সিঁড়িতে? দ্রুত পায়ে কে নেমে আসছিল চারতলা থেকে?

সন্ধ্যামালতীর মুখ থেকে কে যেন শেষ রক্তবিন্দুটুকু পর্যন্ত শুষে নিলে। পাংশু হয়ে গেল পাতলা ঠোঁট দুখানা। সাক্ষীর ডকের রেলিং ধরে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন আড়ষ্ট হয়ে। কোনো জবাব এল না তাঁর কাছ থেকে।

ধীর-গম্ভীর গলায় রমেন বোস আবার জিজ্ঞেস করলে, বলুন, সে-রাতে কাকে দেখেছিলেন সিঁড়িতে?

শ্বেত পাথরের মূর্তির মত বোবা হয়ে রইলেন সন্ধ্যামালতী। সেই কঠিন বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে রমেন বোসেরও মুখের চেহারা বদলে যেতে লাগল। ব্যগ্র কণ্ঠে বললে, বলুন জবাব দিন আমার প্রশ্নের। আপনার জবাবের ওপর এই মামলার বিচার নির্ভর করছে সন্ধ্যামালতী দেবী।

শ্বেত পাথরের মূর্তি তবু মুখ খুলল না

হাল ছাড়লে না রমেন বোস, আবেগ-স্পন্দিত গলায় আবার বলতে লাগল, তাকিয়ে দেখুন ওই আসামীর কাঠগড়ার দিকে। যে লোকটি ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, একটু আগে তাকেই আপনি বলেছেন সন্তানের অধিক, যার সেবা আর সাহায্য না পেলে আপনি বাঁচতেন না। সেই ছেলেকে আজ আপনি বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না? হলেই বা বিমাতা, তবু তো আপনি মা! আমি মিনতি করছি সন্ধ্যামালতী দেবী, যা সত্য, তাকে আলোয় আসতে দিন। বলুন ঘটনার রাতে সিঁড়ি দিয়ে কাকে নেমে আসতে দেখেছিলেন?

সন্ধ্যামালতীর দুই চোখ তখন অশ্রুতে ভেসে গেছে। থরথর্ করে কাঁপছে তাঁর পাংশু দুখানা ঠোঁট। সজল কম্পিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, কুণাল।

কে সে?

আমার নিজেরে ছেলে।

কি করে?

জাহাজে কাজ করত।

★

খিদিরপুরে হংকং কাফে জাহাজী খালাসীদের একটা বিখ্যাত আড্ডা। ইতালি, স্পেন, চীন, জাপান, লিভারপুল, মোম্বাসা, আরো নানা দূর দেশ থেকে কত বাণিজ্য-জাহাজ এসে নোঙর ফেলে খিদিরপুর ডাকে। দিন কয়েক— বড় জোর মাসখানেক থাকে, মাল খালাস করে, মাল বোঝাই করে, নতুন রং লাগায়।

তারপর আবার একদিন জাহাজের ঠাণ্ডা ইঞ্জিন চলার উৎসাহে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আকাশে আকাশে ভোঁ বাজিয়ে, বৃহৎ চাকায় গঙ্গার গেরুয়া জল কাটতে কাটতে নীল সমুদ্রের ডাকে উতলা হয়ে' রওনা দেয়। যাযাবর জাহাজ! ফেলে-আসা বন্দরের স্মৃতি তার মনেও থাকে না।

জাহাজের যারা খালাসী মাল্লা, তারাও যাযাবর। জীবনের বারো আনা সময় তারা সাগর-পথিক, চার আনা সময় মাটির সঙ্গে সম্পর্ক। বন্দরের মাটিতে পা দিয়েই তাদের মনে হয়, এটা দু'দিনের বাসা।

দু'দিনের হ'লেও এখানে তারা অনেকখানি স্বাধীন। জাহাজে কাপ্তেনের রাজত্ব, কড়া শাসন। সেই শাসনের শিকল থেকে সাময়িক মুক্তি দেয় বন্দরের মাটি। তাই বন্দর তাদের কাছে লোভনীয়, রমণীয়, মোহময়।

হংকং কাফে জাহাজী মাল্লাদের একটা মধুচক্র বিশেষ। সুন্দর একটা বাগানের মধ্যে এই পানশালাটি। সন্ধ্যে হলেই এই কাফে রূপসী বারনারীর মতো সেজেগুজে দেশ-বিদেশের খালাসীদের হাতছানি দেয়।

পণ্যানারীদেরও আসা-যাওয়া আছে এখানে। রঙিন পানীয়ের সঙ্গে রঙ-করা রূপেরও দরদস্তুর চলে। তারপর একসময় টলটলায়মান তরুণ খালাসী সাহেবের বাহুলগ্না হয়ে' তার মায়ের বয়সী ভাড়াটে প্রণয়িনী গালে রুজ আর ঠোঁটে লিপষ্টিক মেখে, বাঁধানো দাঁতের হাসি হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।

হংকং কাফেতে রোজই ভীড়। ঝলমলে আলোয়, উচ্ছল নাচ-গানে, উদ্দাম হাসিতে সন্ধ্যে থেকে প্রায় সারারাতই এই পানশালা জমজমাট। কে আসে, কে যায়, কে তার খোঁজ রাখে!

তবু খোঁজ রাখতে হয় এক জাতের মানুষকে। তাদেব নাম পুলিশ। মাঝে মাঝে হুস্ হুস্ করে' একখানা জীপ গাড়ি এসে থামে। তাবা নেমে গটগট করে' হলঘরের মধ্যে চলে যায়, একে প্রশ্ন করে, ওকে জেরা করে। তারপর কোনোদিন এমনিই ফিরে যায়, কোনোদিন বা ছু'একজন মধুপানরত ভ্রমরকে জামার কলার ধরে টেনে নিয়ে যায়। পরদিন শোনা যায়, তারা ফেরারী আসামী।

হংকং কাফে বড় বিচিত্র জায়গা।

*   *   *   *   *

ফটক পেরিয়ে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠ্‌লেই মস্তবড় হল্‌ঘর। এক-দিকে তার নাচের ছোট মঞ্চ আর অর্কেষ্ট্রাদলের বসবার আসন, বাকি জায়গাটা জুড়ে ছোট ছোট বেতের গোল টেবিল আব চারখানা করে বেতের চেয়ার।

হলঘরের একেবারে একটেরে বারান্দা ঘেঁষে একখানা চেয়ার দখল করে বসে আছে বৃজলাল। তার টেবিলে বাকি তিনখানা চেয়ার এখনো খালি। অন্যান্য টেবিল মধুপিয়াসীদের ভীড়ে ভ'বে উঠেছে। সমস্ত হল-ঘরটা তাদেরই হাসি গল্প কথাবার্ত্তায় মৌচাকের মতো গুঞ্জরিত।

এইমাত্র একটা নাচ হয়ে গেল, পিয়ানোতে এখন টুং টাং করে 'ওভার দি ওয়েভস্' বাজছে। বৃজলালের কোনো দিকেই খেয়াল নেই। এমন কি তার নতুন বন্ধুবা—য়্যালফ্রেড আর ইসমাইল টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে 'হ্যালো বৃজলাল' বলে সম্ভাষণ করা সত্বেও কোনো জবাব দেয় নি সে।' তাদের সম্ভাষণ হয়ত কানেই যায়নি তার।

বৃজলাল এ অঞ্চলে হালে এসেছে। লোকে জানে ডকে কাজ করে সে। বাপ ভাই বৌ বোন—কোনো বালাই নেই। স্রেফ একা মানুষ। বাজারের কাছে একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে, আর ছু'বেলা হোটেলে খায়। ঘরে তার প্রায়ই তালা ঝুলতে দেখা যায়। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোরে সেই জানে।

সহজে মেশে না কারো সঙ্গে। বন্ধু তার খুবই কম, কিন্তু চেনে অনেকে। তার কারণ বৃজলালের চেহারাটা মন্দ নয়, অন্তত ভীড়ে মিশিয়ে যাবার মতো

নয়। কিন্তু উগ্র একটা রুক্ষতার ছাপ তার সর্ব্বাঙ্গে। মুখখানায় অশিক্ষিত চোয়াড়ে ভাব, টানা চোখের কোণে অসংযত জীবনের কালো ইতিহাস। দেখতে মোটামুটি সুন্দর হলেও বৃজলালকে ভদ্র বলতে যেন বাধে।

একপাত্র 'জিন' সামনে রেখে বৃজলাল বড় অন্যমনস্ক হয়ে বসে আছে আজ। ডান হাতের তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে ধূমায়িত সিগারেট। অন্যদিন এত চুপচাপ সে থাকে না, ডক-শ্রমিক য়্যালফ্রেড আর ইসমাইলের সঙ্গে গল্প হাসা-হাসি করে। কদাচিৎ বা দু একটি পণ্যানারীর আবির্ভাব হয় তার টেবিলে।

আজ কিন্তু বৃজলাল নিজের মধ্যেই ডুবে আছে। একা একা বসে মাঝে মাঝে 'জিনে'র গেলাসে মৃদু চুমুক দিচ্ছে আর কি যেন ভাবছে। ঠিক ভাবছে না, নিজেরই জীবন-নাটকের গোড়ার দিকের দু' একটা অঙ্ক নিজেই যেন দর্শক হয়ে নীরবে দেখছে।

*　　*　　*　　*　　*

ভালো করে যখন তার জ্ঞান হয়েছিল, সেই তখন থেকেই সংসারে মা ছাড়া আর কাউকেই দেখে নি। মাঝে মাঝে বয়স্ক একটি ভদ্রলোক আসতেন, শ্যামবর্ণ, দীর্ঘ দেহ, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, চেহারা সম্ভ্রান্ত। শুনেছিল তিনি নাকি খুব বিদ্বান্।

তিনি এলেই মা তাকে বলতেন, ও ঘরে গিয়ে খেল গে।

একদিন সে জিজ্ঞেস করেছিল, ও কে মা?

গম্ভীর হয়ে মা বলেছিলেন, তোমার বাবা।

এ কথা শুনে সেদিন তার শিশু-মন খুশী হওয়ার বদলে আশ্চর্য্যই হয়েছিল। এ কেমনতর বাবা? তাকে দেখলে হাসে না, আদর করে না, কাছে ডেকে একটা লজেন্সও দেয় না! আর পাঁচজন ছেলের বাবাদের সঙ্গে তার বাবার কোথাও মিল নেই।

স্কুলে ভর্ত্তি হবার পর তার বাবা দেখা হলে শুধু একটি প্রশ্নই করতেন, পড়াশুনো কেমন হচ্ছে?

এ ছাড়া আর কোনো কথা নয়। অথচ, তার স্পষ্ট মনে আছে, স্কুলে তার বাড়ির অভিভাবক হিসেবে তার মায়ের নামই লেখানো ছিল।

এর কারণটা ছোটবেলায় বুঝতে না পারলেও বড় হয়ে সে জানতে পেরেছিল। তার বাপ-মায়ের বিবাহিত সম্পর্কটা আর দশজন স্বামী-স্ত্রীর মতো খোলাখুলি ছিল না—ছিল ঢেকে রাখা। তাঁদের দাম্পত্য পরিচয়টা সমাজের সামনে কুণ্ঠিত হয়ে থাকত, তার মধ্যে কোথায় যেন অগৌরব লুকানো।

তবু মনে পড়ে, বাড়িতে একদিন তার বাবা এসেছিলেন। সেদিন তার জন্মদিন। তাকে প্রণাম করতে বলে তার মা বাবাকে বলেছিলেন, আশীর্ব্বাদ করো এ যেন ভালো হয়—যেন তোমারই আদর্শে মানুষ হয়ে ওঠে।

সেদিন তাব বাবা কি জবাব দিয়েছিলেন, তাও স্পষ্ট মনে আছে। অল্প একটু হেসে তিনি বলেছিলেন, ভালো মন্দ হওয়ার বীজ মানুষ তাব রক্তে নিয়ে জন্মায়। শুধু আশীর্ব্বাদে তাকে বদলানো যায় না মালতী।

তারপরে বাবা মণিব্যাগ খুলে কিছু টাকা মায়ের হাতে দিয়ে বললেন, ওকে ওর পছন্দমতো কিছু কিনে দিও।

বৃজলালেব আনন্দ হওয়ারই কথা। কিন্তু দুবন্ত একটা অভিমানে তার ছোট্ট বুক তোলপাড় হয়ে উঠল। কি জানি কেন তাব মনে হ'ল, এটা বাপের স্নেহ-উপহার নয়। এটা যেন বখশিস দেওয়া—চাকর-বাকরকে যেমন বখশিস দেয় মনিবরা।

সেদিন টাকার বদলে বাবা যদি তাকে কাছে ডেকে একটু আদর করতেন, মাথায় যদি একটু হাত বুলিয়ে দিতেন, তবে হয়তো এ অভিমান তার হত না।

বাপের সম্পর্কে তাব মনে ক্ষোভ থাকলেও তার মা তাকে ভালোবাসতেন খুবই। তবু মাকে সে সব সময় পেত না। সপ্তাহে কয়েকটা দিন বিকেলের দিকে মা যে কোথায় চলে যেতেন তা সে জানত না। মা ফিরতেন রাত করে, তার আগেই দাসী নানুর মা তার পিঠ চুল্‌কে চুল্‌কে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিত। কখনো ঘুমের মধ্যেই সে অনুভব করত মা তার গালে আল্‌তো ভাবে চুমো দিচ্ছেন।

বৃজলালও তার মা'কে অসম্ভব রকম ভালোবাসত। বাপকে না পাওয়ার ক্ষুধা সে মায়ের মধ্যেই মিটিয়ে নিত। মা যখন তাকে বুকে জড়িয়ে মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করতেন, খোকা তুই বড় হয়ে খুব ভালো হবি ত'? আমার মনে কষ্ট দিবি না?

বালক বৃজলাল তখন মনে মনে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বস্‌ত—যেমন করেই হোক ভালো সে হবেই। আর, সে কি যেমন-তেমন ভালো? পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভালো। মা'কে সে কক্ষনো কষ্ট দেবে না, সবাই তার মা'কে দেখে বল্‌বে, ওই যে 'ভালো' বৃজলালের মা!

মা'কে তখন সে আরো-অনেক ভালোবাসবে। আকাশের মতো অনেক!

কিন্তু মা ছেলের সেই ভালোবাসায় একদিন ভাঙন ধরল। বিশাল কোনো নদীর ওপর কংক্রিটের সেতুতে হঠাৎ একদা যেমন ফাটল ধরে। মিশনারী এক স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিল বৃজলাল। নীলরঙের কলারওয়ালা সাদা পোষাক পরে গলায় নীল টাই ঝুলিয়ে রোজ সে স্কুলে যেত। ফাদার রেক্টরকে আজো তার মনে পড়ে। ভয়ানক রাসভারি চেহারা ছিল তাঁর, ভীষণ কড়া মানুষ। পোষাকে একটু ময়লা বা বুটজুতোয় সামান্য কাদা লেগে থাকলে ধম্‌কে দিতেন। স্কুল বসার আগে প্রার্থনার সময় কেউ উসখুস করলে, শাস্তি স্বরূপ ছুটির পরে একঘণ্টা আটকে থাকতে হত।

কিন্তু না, বৃজলাল কখনো আটকে থাকেনি। শুধু লেখাপড়ায় নয়, নিয়মানুবর্ত্তিতা আর শান্ত ভদ্র ব্যবহারে সে জুনিয়ার ক্লাসে আদর্শ ছাত্র ছিল। অমন যে রাসভারি ফাদার রেক্টর, তিনিও বৃজলালের সঙ্গে হেসে কথা বলতেন।

* * * *

জিনের গেলাসে একটা চুমুক দিলে বৃজলাল। জুনিয়ার ক্লাসের সেই দিনগুলি কত মধুরভাবে কেটেছিল। কিন্তু তারপর? সেই দিনটা—সেই কালো কুৎসিৎ দিনটা একটা বিষাক্ত ক্ষতের চিহ্ন রেখে গেছে তার মনে। সে চিহ্ন এ জীবনে মুছবে না।

বৃজলাল তখন সিনিয়ার ক্লাশের ছাত্র। লম্বা-চওড়া জোয়ান ছেলে।

একদিন তার সহপাঠি নীলকান্ত একখানা পত্রিকা এনেছিল। পত্রিকাখানা সিনেমা আর থিয়েটার সংক্রান্ত। অনেক রংবেরংয়ের ছবিতে ভরা। নীলকান্ত ছেলেটা ভদ্রলোকের এক কথার মতো বছর তিনেক ধরে একই ক্লাসে ছিল। পয়সাওয়ালা ঘরের ছেলে, সুতরাং স্কুলের মাইনেটা জমা পড়ত ঠিকই, কিন্তু পাঠ্য পুস্তকে রুচি ছিল না নীলকান্তর। সে ক্লাসের লাষ্ট বেঞ্চে বসে বসে

নিবিষ্ট চিত্তে যা পড়ত, তা হয় সিনেমা-থিয়েটারের পত্রিকা, নয় প্রায় নগ্ন নারীমূর্ত্তির ছবিওয়ালা স্বাস্থ্যবিষয়ক আমেরিকান ম্যাগাজিন, কিম্বা ওই ধরণের আর কিছু।

নীলকান্তর নিজস্ব পাঠ্য-পুস্তকগুলির প্রতি বৃজলালের কোনোদিনই কৌতূহল হয়নি। সে-অবকাশও তার ছিল না। নিজের পড়া নিয়েই সে ব্যস্ত থাকত। সেজন্য নীলকান্ত এবং লাষ্ট বেঞ্চের অন্যান্য ছেলেদের কাছ থেকে 'ভাল ছেলে' 'বিদ্যেসাগরের পকেট এডিশন' ইত্যাদি দু'চারটে বাঁকা মন্তব্য মাঝে মাঝে তাকে শুনতে হয়েছে। বৃজলাল অবশ্য গ্রাহ্য করেনি।

কিন্তু সেদিন টিফিনের ঘণ্টায় নীলকান্তব হাতের পত্রিকাখানা হঠাৎ চোখে পড়ে যেতেই একবার নেড়ে চড়ে দেখার ইচ্ছে হ'ল বৃজলালের। চেয়ে নিল সে নীলকান্তর কাছ থেকে। সিনেমা-শিল্পীদের কতরকম ছবি। কত সাজে, কত ঢঙে। পাতার পর পাতা উলটে যায় বৃজলাল।

হঠাৎ একটা পৃষ্ঠায় তার চোখ যায় আটকে। সমস্ত চেতনা দুই চোখের তারায় জড়ো করে' সে চেয়ে থাকে একখানা ছবির দিকে। সুন্দরী একটি নারীর ফোটো। এ নারীটিকে সে চেনে, অথচ চেনেও না। টানা টানা আশ্চর্য্য ওই দুটি চোখ বৃজলালের আজন্ম চেনা, কিন্তু সে-চোখে এ কেমনতর দৃষ্টি? পাৎলা দুটি অধরে এ হাসিই বা কেমন ধারা? মাথায় আধ-ঘোমটা কই? ঘাড়ের কাছে নুয়ে-পড়া এলোখোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো!

ছবির নীচে লেখা, বঙ্গ নাট্যকাশের দীপ্তিময়ী তারা। আর, তার তলায় যে নাম লেখা, সেটা তার মায়ের নাম নয়। তবু এ তার মায়েরই ছবি।

তার মা থিয়েটারের অভিনেত্রী! না, না, এ অসম্ভব।

বৃজলালের মুঠোয় জোর ছিল। পত্রিকাখানা তার শক্ত মুঠোর মধ্যে দুমড়ে মুচড়ে বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল! নীলকান্ত চটে গিয়ে বললে, এঃ, অমন সুন্দর সুন্দর ছবিগুলো কি করলি বল দেখি!

উত্তরে বৃজলাল শুধু বলেছিল, বেশ করেছি।

তারপর দলা পাকানো পত্রিকাখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল জানলা গলিয়ে। তার মুখ-চোখের পানে তাকিয়ে নীলকান্ত একটি কথাও আর বলেনি।

সেদিন বাড়ি ফিরে মা'কেও সে কোনো কথা বলেনি। বারবার শুধু

সেই ছবিখানার সঙ্গে মায়ের মুখখানা মিলিয়ে দেখেছিল। সেই মুখ কি এই মুখ?

ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি বৃজলাল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়নি। সন্দেহ মেটাবার জন্যে সে যা করেছিল, আজ পরিষ্কার মনে আছে তার।

কখনো যা করেনি, সে একদিন তাই করল। মায়ের বাক্স থেকে কয়েকটা টাকা চুরি করল! আর, সেই টাকা নিয়ে সে গেল থিয়েটারে। একা। টিকিটও কিনল একখানা, কিন্তু ঢুকল না।

থিয়েটারের লবীতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখতে লাগল অভিনেতা অভিনেত্রীদের ফ্রেমে সাজানো রয়েছে সেই পত্রিকায় দেখা ছবি। লবীর ভীড়টা সেইখানেই বেশি।

ঢুকতে গিয়েও ঢুকতে পারে না বৃজলাল। কেমন ভয় ভয় করে। সে যা দেখতে চায় না, যদি থিয়েটারেব ভেতরে গিয়ে তাই দেখতে পায়!

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে বৃজলাল ঢুকল থিয়েটার-হল্'এ। টর্চের আলো ফেলে একজন লোক তার আসন দেখিয়ে দিল। জীবনে তার সেই প্রথম থিয়েটারে আসা। সেই প্রথম আর সেই শেষ।

নিজের আসনে বসে বৃজলাল ভালো করে তাকালো ষ্টেজের দিকে। তার মা কোথায়? নেই ত'! একজন বৃদ্ধ, একটি যুবক আর একটি বৌ কথা বলছে। তাদের কথা সে তেমন মন দিয়ে শোনে নি, শুধু রতনবাঈ নামটা বার কয়েক তার কানে এল। রতনবাঈকে নিয়েই এদের মধ্যে একটা অশান্তি দেখা দিয়েছে।

হঠাৎ ষ্টেজের আলো নিভে গেল, আর অন্ধকারের মাঝেই ষ্টেজটা ঘুরতে লাগল। আবার যখন আলো জ্বলে' উঠল, তখন চমৎকার মেয়ে-গলার গান সুরু হয়ে গেছে। বৃজলাল দেখলে, একটা সুসজ্জিত ঘরের মাঝখানে ফরাস পাতা, তার একদিকে একজন সারেঙ্গী, আর একজন তবলা বাজাচ্ছে। অন্যদিকে আগের দৃশ্যে দেখা সেই যুবকটি আর তার দুচার জন বন্ধু তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে। সামনে একটা বোতল আর গোটাকয়েক গেলাস। কিন্তু মাঝখানে ও কে? পরণে ঝলমলে পেশোয়াজ, পিঠে জরীজড়ানো দীর্ঘ বেণী, চোখে কাজল, ঠোঁটে রং—গানের তালে তালে ও কে নাচছে হাজার লোকের চোখের সামনে? ও কি রতনবাঈ, না তার মা?

সুখের লাগিয়া

চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল বৃজলালের। দপদপ করতে লাগল কপালের দু'পাশের রগ। নিজের নিঃশ্বাসে নিজেরই ঠোঁট পুড়ে যেতে লাগল। স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে উঠল সে, চীৎকার করে ডাকতে গেল, মা! কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোবার আগেই পেছনের আসনের এক দর্শক বলে উঠল, বসুন মশাই বসুন।

মুহূর্তে বৃজলাল নিজেকে সামলে নিল। তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল প্রেক্ষাগৃহ থেকে। যেন সবাই জেনে ফেলেছে, সে থিয়েটারের অভিনেত্রীর ছেলে—যে অভিনেত্রী হাজার লোকের চোখের সামনে রং মেখে বাঈজী সেজে দেহ দুলিয়ে নাচতে লজ্জা পায় না!

সেদিন অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিল বৃজলাল। দশটার পর।

মা জেগে বসেছিলেন। সেই মা! তেমনি সুন্দর শান্ত, টানা টানা চোখ দু'টিতে তেমনি মিষ্টি কোমল চাউনি, পরণে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। জন্ম থেকে যে মুর্ত্তি দেখছে বৃজলাল।

এক মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেল তার। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে গেল থিয়েটারের সেই দৃশ্য। ষ্টেজের ওপর ঝলমলে পেশোয়াজ পরে' জড়িজড়ানো বেণী দুলিয়ে রাঙা ঠোঁটে বিশ্রী একরকম হাসি ছড়িয়ে রতনবাঈয়ের সেই নাচ!

আবার জ্বালা করে' উঠল মনটা।

তবু সে কোনো কথা বলে নি। কোনো প্রশ্ন করে নি মা'কে। মা খেতে ডাকায় শুধু বলেছিল, খিদে নেই। তারপর শুয়ে পড়েছিল নিজের বিছানায়।

মা একবার তার কপালে হাত দিয়ে দেখেছিলেন। আর কিছু বলেন নি।

শুয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু ঘুম আসে নি প্রায় সারারাত। তাদের বাড়ির কাছে-পিঠে একটা রাজবাড়ির দেউড়িতে প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজতো। সে-রাতে শুয়ে শুয়ে বৃজলাল শুনেছিল বারোটা একটা দু'টো বেজে যাচ্ছে। এমনি করে সাড়ে তিনটেও বেজে গেল। খোলা জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে তার তপ্ত কপালে হাত বুলিয়ে দিল। জানলার একেবারে ধারেই যেন নেমে এল শেষরাতের ঝকঝকে বড় তারাটা। তারপর আর কিছু দেখে নি সে, আর কোনো শব্দও শোনে নি। ঘুমিয়ে পড়েছিল অগাধে।

সুখের লাগিয়া

সেদিন রাত সাড়ে তিনটে অবধি জেগে জেগে কি সব ভেবেছিল, বৃজলাল আজো তা ভুলে যায় নি।

বারবার একটা কথাই তার মনে চোর-কাঁটার মতো খচখচ করছিল। তার মা থিয়েটারের নটী—বাঈজী সেজে রং মেখে দেহ দুলিয়ে হাজার লোকের চোখের সামনে নাচে। নীলকান্তর সঙ্গে তার বেশি মেলা-মেশা না থাকলেও তার মুখে সে শুনেছিল থিয়েটারের অভিনেত্রীরা ভালো হয় না, ভদ্র হয় না। ওই নীলকান্ত যখন শুনবে বৃজলালের মা ডায়মণ্ড থিয়েটারের নাম-করা অভিনেত্রী, তখন কি ভাববে? কি বলবে সে বৃজলালকে?

অন্ধকারের মধ্যেও বৃজলাল যেন স্পষ্ট দেখতে পেল, নীলকান্তর মুখে বাঁকা হাসি, চোখে ঘেন্নার দৃষ্টি, ভঙ্গিতে তাচ্ছিল্য।

সেই বাঁকা হাসি, ঘৃণার দৃষ্টি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে আরো বহুজনের মুখে চোখে। সবাই এড়িয়ে চলবে তাকে, বন্ধু বলতে লজ্জা পাবে, অবজ্ঞা করবে। সামনে হয়ত কিছু বলবে না, কিন্তু আড়ালে মুখ বেঁকিয়ে বল্‌বে, নটীর ছেলে!

আশ্চর্য্য, একটা রাতের মধ্যেই মানুষের পরিচয় আকাশ-পাতাল তফাৎ হয়ে যায়! কাল সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার কোনো ভদ্র পরিচয় থাকবে না। সে আর ভদ্রঘরের ছেলে নয়। একটা রাস্তার ছেলের সঙ্গে বৃজলালেরও আর কোনো তফাৎ নেই।

অথচ তার এই লজ্জাকর ঘৃণ্য পরিচয়টা এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল তার মা। এই লুকিয়ে রাখাটাই তার জীবনে আরো বেশি লজ্জার। কাল থেকে কি করে সে মুখ দেখাবে স্কুলে? কেমন করে উঁচু মাথায় দাঁড়াবে সে ফাদার রেক্টরের সামনে?

আজ সে বুঝতে পারলে, কেন তার বাবা চুপিচুপি আসেন আর চুপি-চুপি চলে যান। কেন থাকেন না তাদের সঙ্গে, কেন তাকে কাছে টেনে আদর করেন না। বাপ হয়েও ছেলেকে তিনি ঘৃণা করেন নিশ্চয়। সে যে নটীর ছেলে।

বৃজলালের মনে হল, তবে আর কেন ভদ্র হওয়ার চেষ্টা—ভালো হওয়ার প্রয়াস? হাজার পালিশ করলেও গিলটি কখনো সোনা হয়? কি হবে লেখাপড়া শিখে ভালো হয়ে? একটা নটীর ছেলেকে দুনিয়ায় কে ভালো বলে

স্বীকার করবে ? সারা গায়ে তার মায়ের দেওয়া কালির দাগ লেগেছে, সেই কালো পরিচয় নিয়েই তাকে জীবন কাটাতে হবে।

না, অনর্থক সে আর ভদ্র হওয়ার চেষ্টা করবে না।

সে রাতে নিজের ওপর সহসা কেমন যেন নিষ্ঠুর আর হিংস্র হয়ে উঠেছিল ষোলো বছরের কিশোর বৃজলাল।

* * * *

তারপর থেকেই মোড ঘুরে গেল তার জীবনেব।

ভিড়ে গেল সে নীলকান্তর দলে। যোগাযোগটাও হয়ে গেল সহজেই।

স্কুলের ছুটির পর সেদিন ফটকের বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল বৃজলাল। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে নেই। অথচ কোথায় যাওয়া যায়, তাও মনে মনে খুঁজে পাচ্ছিল না।

পিঠের ওপর একখানা হাত পড়ল আলগোছে। বৃজলাল তাকিয়ে দেখলে নীলকান্ত। নীলকান্ত তার চেয়ে মাত্র বছর দুই-তিনের বড, তবু তার চোখের কোল দুটো বসা। সেই কোটরে বসা চোখ নাচিয়ে নীলকান্ত বললে, কি হে গুড বয়, চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন ?

এমনি।

বাড়ি যাবে না ? মা যে দুধু-ভাতু নিয়ে বসে আছে।

বৃজলালের মনটা এক মুহূর্ত্তে তেতো হয়ে গেল। মা কোনোদিনই বিকেলে তার জন্যে বাড়িতে বসে থাকেন না, এ সময় তিনি থাকেন থিয়েটারে।

একটা অদ্ভুত বেপরোয়া মন দিয়ে বৃজলাল নীলকান্তকে জিজ্ঞেস করল, তোরা কোথায় যাস ছুটির পর ?

আমরা ? আমরা আড্ডা দিতে যাই। সে খোঁজে তোমার কাজ কি সোনার চাঁদ।

চল্ তোদের সঙ্গে যাই।

নীলকান্তর কোটরে বসা চোখ দুটো স্থির হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত্ত, তারপর সবিস্ময়ে বলে উঠল তুই যাবি—আমাদের আড্ডায় !

নীলকান্তর পেছনে দাঁড়িয়েছিল উমাপতি আর বিলাস ওরফে বিলে।

তারা হৈ হৈ করে উঠল। বলিস কি রে গুড বয়! আমাদের দলে ভিড়লে তুই খারাপ হয়ে যাবি যে!

বৃজলাল গম্ভীর হয়ে শুধু বললে, খারাপই হব আমি। কোথায় যাবি চল্।

চল্তে চল্তে নীলকান্ত বললে, বুঝেছি, মনটা তোর বিগড়ে আছে আজ। আচ্ছা দাঁড়া, মন ভালো করে দিচ্ছি।

নীলকান্তর পকেট থেকে বেরোল সিগারেটের একটা প্যাকেট। একটা নিজের মুখে গুঁজে আরেকটা বৃজলালকে দিলে। বললে, নে টান।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থতিয়ে গেল বৃজলাল। সিগারেট!

নীলকান্ত মুখ টিপে হেসে বললে, কি সোনার চাঁদ, খারাপ হওয়ার সাধ মিটে গেল?

বিলে ফস্ করে বৃজলালের হাত থেকে সিগারেট নিয়ে নিজে ধরিয়ে বললে, আরে দূর, তুই একটা নাডুগোপাল! যা যা, মায়ের কোলে বসে দুধু-ভাতু খা গে যা!

নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হ'ল বৃজলালের। কেমন যেন অপমানিত বোধ হ'ল। তীব্র চোখে চেয়ে বিলেকে ধমকে উঠ্ল, থাম্।

তারপর বিলের মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা আচমকা নিয়ে একটা টান দিলে সে। টেনেই কিন্তু কেসে ফেললে।

নীলকান্ত হেসে বললে, জিতা রহো বেটা। দু'দিনেই অভ্যেস হয়ে যাবে!

চলতে চলতে তারা এল একটা পার্কে। ছোট পার্ক, নিরিবিলি। একটা ঝোপের আড়ালে বসল তারা। বিলের পকেট থেকে বেরিয়ে এল এক জোড়া তাস, সুরু করলে সে ভাঁজতে। এসে জুট্ল আরো দুটি ছোকরা। চেহারেতেই মালুম তারা কোন শ্রেণীর।

বিলে বৃজলালকে শুধোলে, ক্যাশ আছে পকেটে?

আছে কিছু। কেন?

তা হলে তোকেও তাস দেব।

কি খেলা?

তে-তাস।

বিলে তিনখানা করে তাস দিলে-প্রত্যেককে। মাঝখানে পড়তে লাগল

পয়সা। সুরু হয়ে গেল তাসের জুয়া। পুড়তে লাগল অনেক সিগারেট। দু' তিন দানেই খেলাটা শিখে ফেললে বৃজলাল।

খারাপ হওয়ার পথে সেই প্রথম তার হাতে খড়ি।

ছবির মতো সব যেন দেখতে পাচ্ছে বৃজলাল। সন্ধ্যে অবধি পার্কে কাটিয়ে তারা গেল একটা সস্তা রেঁস্তরাব কেবিনে। নীলকান্ত তার খাতার মধ্যে থেকে মোটা একখানা খাম বার করে' বললে, আজ যা দেখাব, দেখে তোদের তাক লেগে যাবে মাইরি।

সবাই ঝুঁকে পড়ল খামখানার ওপর। তার ভেতর থেকে বেবোল খান কয়েক নিষিদ্ধ ফরাসি ছবির কার্ড। দেখে বৃজলালের কান লাল হয়ে উঠল, তবু চোখদুটো বারবাব গিয়ে পড়তে লাগল ছবিগুলোর ওপর।

নীলকান্ত আর সঙ্গীদের মধ্যে হাসাহাসি চলতে লাগল। চলতে লাগল অশ্লীল কথা আর রসিকতা। বিলাস একটা বিশ্রী গান ধরে দিলে। আব সব কিছুর মাঝে ষোলো বছরের নিষ্পাপ কিশোর বৃজলাল ব'সে ব'সে ভাবতে লাগল, কাল থেকে এদের সঙ্গে সে আর কথাও বলবে না।

কিন্তু খারাপ হওয়ার পথটা ঢালু। একবাব সে পথে পা দিলে তর্‌তর্ করে' নেমে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। বৃজলালেব অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে।

পরদিন স্কুলেব ছুটিব পর বৃজলাল আবার গেল নীলকান্তদের আড্ডায়। তার পরের দিনও। তারপর থেকে রোজ নিয়মিত! নীলকান্ত তার প্রাণের বন্ধু হয়ে উঠল!

সিগারেট টানতে আর তার কাসি আসে না। তে-তাস খেলায় সে পাকা হয়ে উঠল। ফরাসী নিষিদ্ধ ছবি দেখলে আর কান লাল হয় না। কেউ অশ্লীল রসিকতা করলে বৃজলাল তার জবাব দিতে পারে।

তাসের জুয়ায় প্রায়ই সে হারত। ফলে মায়ের দেরাজে প্রায়ই তার হাত পড়ত। কখনো বা স্কুলের বই দু একখানা পুরাণো বইয়ের দোকানে চলে যেত। তবু জুয়ার আড্ডায় বৃজলালের কামাই হত না একদিনও।

কিন্তু মায়ের দেরাজ একদিন বন্ধ হয়ে গেল, ফুরিয়ে এল স্কুলের পাঠ্য বই। মুস্কিলে পড়ে গেল বৃজলাল, খুঁজতে লাগল উপায়।

উপায়ও মিলে গেল একসময়। সহজেই।

সুখের লাগিয়া

ক্লাসে সেদিন সুধীরের দামী ফাউণ্টেন পেনটা হারিয়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি, দারোয়ান চাকর ঝাড়ুদারকে অনেক জেরা। তবু পাওয়া গেল না।

বিকেলে পার্কে গিয়ে বিলে তাদের বললে, দাঁড়া, এখুনি আসছি।

অদূরে একটা বেঞ্চে আধাবয়সী এক ভদ্রলোক বসেছিলেন। বিলে তাঁর কাছে এগিয়ে গেল। যাবার আগে মাথার চুলগুলো এলোমেলো আর মুখখানা অত্যন্ত করুণ করে' নিলে। পকেট থেকে একটা পেন বের ক'রে ভদ্রলোককে বললে, বাড়িতে ছোট বোনের বড় অসুখ স্যার, ওষুধ কিনতে পারছি না। কলমটা নিয়ে যদি পাঁচটা টাকা দেন—

বৃজলাল আশ্চর্য্য হয়ে দেখল, কলমটা সুধীরের।

মিনিট কয়েক মধ্যেই বিলাস পাঁচটাকার একখানা নোট হাতে বিজয়-গর্বে ফিরে এল। নীলকান্ত বললে, সাবাস বেটা!

সন্ধ্যের পর আড্ডা থেকে বাড়ি ফিরছিল বৃজলাল। বাসে ছিল ভীড়। বৃজলালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল একটি সাহেবি পোষাকপরা ভদ্রলোক। কোটের বুক পকেটে সোনার ক্যাপওয়ালা পার্কার। বৃজলালের হঠাৎ বিলাসের কথা স্মরণ হ'ল। নিসপিস করতে লাগ্‌ল তার হাতের আঙুলগুলো। অথচ বুকের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি।

কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল। হঠাৎ ঘণ্টা বাজিয়ে বাস ভালো করে থামাবার আগেই বৃজলাল নেমে পড়ল।

তার পকেটের মধ্যে তখন সেই সোনার ক্যাপওয়ালা পার্কার! হাতের আঙুগুলো তখনো কাঁপছে থরথর করে।

কিন্তু তারপর থেকে আর কাঁপত না হাত। বদলে যেত না মুখের ভাব। বাহবা দিয়ে বন্ধুরা বলত, ওস্তাদ। বেশ লাগত শুনতে।

ভালো বৃজলাল এমনি করেই একদিন খারাপ হয়ে গেল।

★

অনেকদিন অবধি মা টের পাননি কিছুই। কিন্তু চোখ এড়ায়নি ফাদার রেক্‌টরের!

শুধু স্বভাবের নয়, মুখের চেহারায়ও পরিবর্ত্তন ঘটেছিল বৃজলালের। কিশোর বয়সের স্নিগ্ধ কমনীয়তা মুছে গিয়ে মুখে ক্রমশঃ ফুটে উঠছিল একটা রুক্ষ চোয়াড়ে ভাব। রং ফর্সা বলেই চোখের কোলে অস্পষ্ট কালো দাগটা বেশি স্পষ্ট দেখাত।

ফাদার রেক্‌টর তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতেন। বৃজলালের ওপরেই তাঁর আশা ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ক্লাসের মাসিক পরীক্ষায় ক্রমেই অবনতি হতে লাগল তার। শেষ অবধি বার্ষিক পরীক্ষায় দেখা গেল বৃজলালের ফল যা অবশ্যম্ভাবী, তাই হয়েছে। ফেল করেছে সে।

রেকটর তাকে ডেকে সেদিন অনেক কথাই বলেছিলেন। তাঁর কথার মধ্যে শাসন ছিল যতখানি, স্নেহ ছিল তার চেয়ে বেশি। কিন্তু সবটাই তিক্ত লেগেছিল বৃজলালের।

স্কুলের নিয়ম অনুসারে চিঠি গেল বাড়িতে। বৃজলালের মায়ের নামে। সেই দিন জানতে পারলেন মা। লক্ষ্য পড়ল ছেলের ওপর। প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হয়ে গেল তাঁর বিশ্বাস। সেই সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যতের আশা স্বপ্ন সুখের কল্পনা। রাগে আর হতাশায় বহু তিরস্কার তিনি করেছিলেন ছেলেকে। চোখের জলও ফেলেছিলেন।

ধরা পড়ে সেদিন লজ্জা অনুতাপ অনুশোচনা সবই হয়েছিল বৃজলালের। এবার থেকে পড়াশুনোয় মন দেবে, আবার ভালো হবে ব'লে মনে মনে শপথও করেছিল। কিন্তু ভালো সে আর হয়নি। হতে পারেনি। নীলকান্তর দল

তাকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরেছিল। তাকে পেয়ে বসেছিল জুয়ার নেশায়।

সুতরাং দিন যেমনই চলছিল, তেমনই চলতে লাগল।

একদিন স্কুলও ছাড়তে হল। জন্ নামে একজন ফিরিঙ্গি সহপাঠীর হাতের রিষ্টওয়াচ একদা খোয়া গেল। টিফিনের ঘণ্টায় ঘড়িটা খুলে রেখে জন 'ভলি বল' খেলছিল, তারপর আর পায়নি!

ঘটনাটা জন্ চুপচাপ রেকটর্‌কে জানায়। রেকটর শুনে কিছুই বললেন না বটে, কিন্তু ছুটির একটু আগে হঠাৎ ক্লাসে এসে বৃজলালকে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজের অফিস ঘরে। ব্যাপারটা এমনই আচমকা যে, বৃজলাল সাবধান হওয়ার অবকাশ পায়নি।

তল্লাসী করতেই তার মোজার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল জন' এর ঘড়ি।

আবার চিঠি গেল তার মায়ের কাছে। চুরির অপরাধে বৃজলালকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

বৃজলাল চোর হয়েছিল আগেই। এবার হ'ল দাগী চোর।

স্কুলের চিঠি শুধু তার মা নয়, তার বাবাও দেখেছিলেন। দেখে কি বলেছিলেন তার মাকে, বৃজলালের মনে আছে: 'আমি ত' বলেছিলাম, ভালো মন্দ হওয়ার বীজ মানুষ তার রক্তে নিয়ে জন্মায়।'

আজ কিন্তু বৃজলালের মনে হয়, ভুল—তার বাবার কথা অত্যন্ত ভুল। জন্মকালে সব শিশুর রক্ত একই রকম থাকে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চারপাশের পরিবেশ অনুসারে কারো রক্তে ভালোর বীজ, কারো রক্তে মন্দের বীজ বোনা হয়ে যায়। সেজন্যে কোনো শিশুই দায়ী নয়।

সেত' আর পাঁচটা ছেলের মতোই ভালো হয়ে জন্মেছিল। লেখায় পড়ায় আচারে ব্যবহারে, সততায় সভ্যতায় ভালো হয়েই উঠছিল। তবে কেন সে খারাপ হয়ে গেল?

কেন সে হয়ে উঠল অশিক্ষিত অসৎ চরিত্রহীন? একি তার বিধিলিপি? না। বৃজলাল তার সমস্ত জীবন দিয়ে বুঝেছে সেদিন একটু যত্ন একটু স্নেহ একটু ভালবাসা পেলে সে হয়ত খারাপ হয়ে যেত না। বড় হয়ে ওঠার পর তার উদাসীন বাপ আর অভিনেত্রী মায়ের কাছ থেকে সে তা পায়নি।

মিশনারী স্কুলের ছাত্র ছিল সে, বাইবেল পড়তে হয়েছিল। আজ তাই

মনে হয় বৃথাই মানবপুত্র পাপীর স্বপক্ষে আবেদন জানিয়ে গেছেন। আজো দুনিয়ায় কেউ শোনেনি তাঁর কথা। শুনতে চায়ও না। অপরাধীকে ঘৃণা করে সবাই। তাই যারা মন্দ, যারা অপরাধী, তারাও মনে প্রাণে ঘৃণা করে তাদের, যারা জীবনে ভালো হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

কিন্তু এসব কথা ভেবে আর কি হবে? কি লাভ ভাল হওয়ার কথা ভেবে? খারাপ হওয়ার রাস্তা বড ঢালু। একবার নামতে সুরু করলে আর ওঠা যায় না।

স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়াতে সুবিধেই হল বৃজলালের। পুরোপুরি খারাপ হওয়ার সুযোগ পেয়ে গেল।

ছোট বৃজলাল ক্রমশঃ বড় হ'ল। সেই সঙ্গে জুয়া থেকে বড় জুয়ায় তার প্রোমোশন হল। মানে তাসের আড্ডা থেকে ঘোড়দৌড়ের মাঠ। ছোট চুরী থেকে বড় চুরিতে হাত পাকাল। আর সিগারেট থেকে উন্নতি হ'ল মদে।

প্রথম যেদিন মদের গন্ধ পেয়েছিলেন মা, সেদিন আহত বিস্ময়ে দুটি মাত্র কথা বেরিয়েছিল তাঁর মুখ দিয়ে, তুই মাতাল! এতটা অধঃপাতে গেছিস!

দ্রব্যগুণে সেদিন বৃজলালেরও মুখ খুলে গেল। সোজা জবাব দিল, নটী মায়ের ছেলে মাতাল জোচ্চোর ছাড়া আর কি হবে?

ছেলের মুখে এ জবাব কোনো মা-ই আশা করে না। বৃজলালের মা পাথর হয়ে গিয়েছিলেন শুনে। একটি কথাও তিনি আর বলেননি। শুধু মিনিট খানেক নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে তিনি ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

বৃজলাল আজো স্পষ্ট দেখতে পায় মায়ের সেই মুখখানি।

দ্বিতীয়বার জিন'এর গেলাস নিঃশেষ করে' বৃজলাল তৃতীয় পেগ্ অর্ডার দিলে। হল্দে সিগারেটের প্যাকেটটা শূন্য হয়ে গেছে। ফেলে দিয়ে পকেট থেকে নতুন একটা প্যাকেট খুললে। মনে মনে বললে, গুলি মারো পুরোনো দিনের চিন্তায়। সে কি হ'ত—কি হ'তে পারত, কাজ কি সে কথা ভেবে? বৃজলাল জুয়াড়ী নেশাখোর চোর এই হল সবচেয়ে স্পষ্ট সত্য। এই পরিচয়ই থাক। দুনিয়ার ভালো মানুষদের সে কেয়ার করে না।

★

তিনটের পর জজ সাহেব আবার এসে আসনে বসলেন। ধীরে ধীরে সাক্ষী সন্ধ্যামালতী এসে দাঁড়ালেন ডকে। রমেন বোস প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, মনে ক'রে বলুন ত' সে-রাতে চারতলার ফ্ল্যাট থেকে কুণাল যখন নেমে এসেছিল, সে সময় তার গায়ে কি ছিল?

তারও গায়ে ছিল সবুজ কোট, লাল টাই।

কুণালও তাই প'রেছিল! কেন?

মাস দুই আগে কুন্তলের জন্মদিন উপলক্ষে ওদের দু' ভাইকে একই পোষাক তৈরী করিয়ে দিয়েছিলাম। সেদিন সন্ধ্যেবেলা এক পার্টিতে যাবে ব'লে দু'জনে একই পোষাক পরেছিল।

ও! সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে কুণাল কি করলে!

আমায় দেখে বললে, 'শোভাকে আমি খুন করে ফেলেছি, পুলিশ এলে দরজা খুলো না।' ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দেওয়ায় নিচে নেমে গেল। আর আসে নি।

সমস্ত আদালত যেন দমবন্ধ করে শুনছে। মিনিট খানেক চুপ করে রইল রমেন বোস। তারপর গাঢ় স্বরে বললে, আর আমার প্রশ্ন নেই সন্ধ্যামালতী দেবী। পারেন তো ক্ষমা করবেন আমাকে।

তাঁকে ধরে একখানা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে, এজলাসের সামনে এসে দাঁড়াল রমেন বোস। অতি ধীরে ধীরে খাদের গলায় বলতে সুরু করলে:

মি লর্ড! জেণ্টল্‌মেন অব দি জুরী! সাক্ষী সন্ধ্যামালতী দেবীর সব কথাই আপনারা শুনলেন। আমি বলেছিলাম, সত্যানুসন্ধানে আদালতকে সাহায্য করব, আশা করি, আমি তা পেরেছি। আমার বিজ্ঞ সহযোগী মিস্টার ভাদুড়ি বলেছেন, নরহত্যা পৃথিবীর জঘন্যতম পাপ। মানুষ খুন

করা জঘন্যতর পাপ কিনা জানি না, তবে পৃথিবীর সবচেয়ে স্বাভাবিক পাপ, ইতিহাস তা বলে। আদি মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এই পাপেরও জন্ম হয়েছিল, আর আজও যে এই পাপ ঘটছে, তার প্রমাণ আমরা আজ আদালতে এসেছি। মানুষের সভ্যতা আর কিছুই করতে পারে নি—মানুষ-খুনের সংখ্যাকে বাড়িয়ে আদর্শবাদের যুদ্ধ বা বিশ্বযুদ্ধ নাম দিয়েছে মাত্র। তাই আজকের মানুষের কাছে মানুষ-খুনটা অতি সাধারণ অপরাধ।

রমেন বোস জুরীদের বেঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়াল: কিন্তু এই অপরাধের বিচার করতে গিয়ে যদি কোন নিরপরাধ মানুষ দণ্ডিত হয়, সেটাই হবে অসাধারণ অপরাধ। সেক্ষেত্রে বিচারক হয়ে যাবেন খুনী। আজকের বিচার-সভাকে তাই আমি সতর্ক করে দিতে চাই। সন্ধ্যা-মালতী দেবীব সাক্ষ্য থেকে জানা গেল যে, নর্তকী শোভা ইম্যানুয়েলকে খুন করেছে কুন্তল চ্যাটার্জি নয়, নেশাখোর জুয়াড়ী কুণাল চ্যাটার্জি। একই বাপের সন্তান হওয়ার দরুণ বা যে কোন কারণেই হোক, কুন্তল কুণালের দেহের গঠন একই ধাঁচের। লম্বাতেও দুজনে প্রায় সমান। আর সে-রাতে সবুজ কোট আর লাল টাইয়ের মিলটা যে নিতান্তই দৈবের ঘটনা নয়, তা'ও সাক্ষীর মুখে শুনলেন। এক্ষেত্রে যমুনা লালার ভুল করা খুব স্বাভাবিক নয় কি?

এখন, সন্ধ্যামালতী দেবী যা সাক্ষ্য দিয়েছেন, তা সত্য কিনা—তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে কি না, এই নিয়ে আইনের প্রশ্ন উঠতে পারে। আমি কিন্তু আইনের তর্ক তুলবো না। কেননা আইনের চেয়ে মায়ের অশ্রুজল অনেক বড়। পৃথিবীতে কোন মা-ই নিজের ছেলেকে মিথ্যে করে খুনের দায়ে জড়াতে পারে না। আর আমার বলার কিছু নেই। মাননীয় জুরীদের আমি অনুরোধ করছি, একবার ওই মহীয়সী মায়ের চোখের জলের দিকে তাকাতে। ওই চোখের জল বলছে, লক্ষ অপরাধীর শাস্তি হোক, কিন্তু জগতে একটিও নিরপাধ যেন শাস্তি না পায়।

রমেন বোস থামলো। তার শেষ কথাগুলো আদালত-ঘরের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

জুরীরা উঠে গেলেন মন্ত্রণা-কক্ষে। ফিরে এলেন পাকা দেড় ঘণ্টা পরে। আদালত রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

সুখের লাগিয়া

জজসাহেব প্রশ্ন করলেন, জেণ্টল্‌মেন অব দি জুরী, আপনাদের সিদ্ধান্ত কি; আসামী দোষী, না নির্দোষ?

নির্দোষ।

সন্ধ্যামালতী দুর্বল পায়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেলেন আদালত-ঘরের একধারে লোহার খাঁচার দিকে—যার মধ্যে কুন্তল তখনও দাঁড়িয়েছিল উদ্‌ভ্রান্তের মতো।

অশ্রুভেজা মুখে অপূর্ব হেসে সন্ধ্যামালতী ডাকলেন, কুন্তল!

কুন্তল শুধু বললে, মা! তারপর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এল।

★

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। কিন্তু হংকং কাফের কিবা দুপুর, কিবা রাত। জাহাজী মাল্লাদের কৃপায় সব সময়ই জমজমাট।

বৃজলাল এখনো বসে আছে নিজের অতীতের সঙ্গে মুখোমুখি হ'য়ে। জিন'এর পঞ্চম পেগ পার হয়ে ষষ্ঠে এসে পৌঁছেচে। মেয়ে-পুরুষে গিস্‌গিস্ করছে পানশালা। বৃজলাল কিন্তু নিজের মধ্যে একা।

লেখাপড়া চুলোয় গেল, রয়ে গেল জুয়া আর মদের নেশা। কিন্তু নেশা মানেই খরচ। মায়ের বাক্স আর গয়না ভেঙে কিছুদিন চলল, তারপর আর চলে না। বৃজলাল অগত্যা জাহাজে কাজ খুঁজতে লাগল। মাল্লার কাজ।

মাল্লার কাজটা উপলক্ষ্য মাত্র, আসল লক্ষ্য হ'ল চোরা-কারবার—যার নাম স্মাগলিং। এতদিনে বৃজলাল একটা মনের মতো কাজ খুঁজে পেল। কি দোষ তার? টাকার দরকার দুনিয়ায় সকলেরই। আর সোজা পথের চেয়ে বাঁকা পথে টাকা আসে অনেক, অনেক বেশি। সে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে কেন বোকার মতো?

জাহাজের কাজে ঢুকে পড়ল বৃজলাল। আর সেই সূত্র ধরেই সীমেনস ক্লাবে প্রথম দেখা তার সঙ্গে।

বৃজলালের ভাবনা হঠাৎ থমকে থেমে গেল। যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার নামটা সে মনে মনেও উচ্চারণ করতে পারল না—যেন অদৃশ্য কান দিয়ে কেউ শুনে ফেলবে!

কিন্তু তা'র লম্বাটে সুঠাম দেহটা আজ দেড়মাস ধরে কেবলই তার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৃজলাল আজো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সীমেনস্ ক্লাবের ডায়াসের ওপর সে নাচছে। ঢেউয়ের মতো ছন্দিত হচ্ছে তার মজবুত দেহ।

দুলে ফুলে উঠছে খাটো ঘাঘরা। রঙিন স্পট্ লাইটের ফোকাসে দেহের যেখায় যেথায় হাতছানি দিচ্ছে তার বন্য যৌবন।

দেশ-বিদেশের বন্দরে অনেক মেয়ে দেখেছে বৃজলাল, কিন্তু এমন মেয়ে তার চোখে পড়ে নি কখনো। মদের গেলাসে চুমুক দিতে ভুলে গিয়েছিল সে।

কিন্তু কে জানত একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে এসে যাবে মেয়েটা। হঠাৎ একদিন দেখা হয়ে গেল তা'দেরই ফ্ল্যাট-বাড়ির সিঁড়িতে। বৃজলাল উঠছিল, মেয়েটা নামছিল। গুচ্ছ গুচ্ছ রেশমি চুলের নীচে ঝকঝকে কালো চোখ তুলে তাকিয়েছিল একবার, তারপর টকটকে লাল ঠোঁটের ফাঁকে একটু অকারণ হেসে নেমে গিয়েছিল।

দারোয়ানের কাছে বৃজলাল খবর পেল, মেয়েটা নতুন ভাড়াটে তারপর আলাপ জমাতে কতক্ষণ? বাপ-মা আর কিছু না দিন, চেহারাটা দিয়েছেন বৃজলালকে। তারই দৌলতে মেয়েদের ভালোবাসার দোরগোড়ায় পৌঁছে যেতে তার আটকাত না। তাদের ফ্ল্যাট-বাড়ির নতুন ভাড়াটের দরজাও খুলে গেল তার জন্যে। পাগল হয়ে গেল মেয়েটা বৃজলালকে পেয়ে।

ভালোবাসা-টাসা বৃজলাল অবিশ্যি বুঝত না, তবু মনে মনে সে একদিন ঠিক করে ফেললে, এবার সে নেশা ছেড়ে দেবে, ভালো হবে, ভদ্রলোক হবে। মেয়েটাকে নৈলে যখন তার চলবেই না, তখন বিয়েই করে ফেলবে রেজিষ্ট্রি করে!

সুন্দরী মেয়ের পাল্লায় পড়লে মানুষ কত বোকা হয়!

রেজিষ্ট্রেশানের দিন পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এক লহমায় ভেস্তে গেল, গেল সবই—যেমন ক'রে ভেস্তে যায় তাসের খেলা।

মেয়েটার বিছানায় একদিন সে একটা বেল্ট দেখতে পেল। বেল্টটা বৃজলালের চেনা—উজ্জ্বল নিকেলের বকলসে ইংরেজি 'ডি' অক্ষরটা মীনে করা। 'ডি' মানে ডিক জোন্স, তার প্রাণের বন্ধু। জাহাজে শুয়োরের মাংস চালান দেয়। টাকার কুমীর। কিন্তু খাল ত' বৃজলাল নিজেই কেটেছিল গত বড় দিনে মেয়েটার সঙ্গে ডিকের আলাপ করিয়ে দিয়ে। তারপরের ব্যাপারটা সংক্ষিপ্ত। একটা রিভলভারের খোঁজেই বেরিয়েছিল বৃজলাল, তাড়াতাড়িতে

তার মুঠোয় এসে গেল পাৎলা একখানা চীনে ছুরি।···তাই সই ! কিন্তু আফশোস এই যে, চকচকে ফলাটা লাল হয়ে উঠল শুধু একজনের রক্তেই। ডিকের রক্ত লাগল না, সে তখন ব্যাংককের জাহাজে।

সে রক্তের দাগ ত' কবে মুছে ফেলেছে বৃজলাল, তবু কেন বারবার চোখ পড়ে নিজের হাতখানার দিকে। মরা মানুষ কেন তাড়া করে বেড়ায় রাতদিন ?

অস্থির হয়ে উঠল বৃজলাল। অন্যমনস্ক চোখ দুটো চঞ্চল হয়ে উঠেই আটকে গেল হল'এর দরজার ওপর। দুটো পুলিশ অফিসার শিকারী কুকুরের মতো অপরাধীর গন্ধ শুঁকছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে তৈরী হয়ে রইল বৃজলাল। কিন্তু না, এগিয়ে এল না তার দিকে, বাইরে থেকেই চলে গেল।

বিড় বিড় করে বলে উঠল বৃজলাল, কুত্তার বাচ্চা !

তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আধ-খাওয়া জিন'এর গেলাসটা মুখে তুলে লম্বা একটা চুমুক দিলে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তার পাশ থেকে কে যেন বলে উঠল, গুড ইভনিং কুণাল চ্যাটার্জি! শোভা ইম্যানুয়েলের খুনের দায়ে আমি তোমাকেই খুঁজছি।—উঁহু, পালাবার চেষ্টা কোরো না, বাইরে পুলিশ হাজির।

পাথরের চোখের মতো স্থির দৃষ্টি মেলে কুণাল দেখলে, নিখুঁত নেভি স্যুট পরা লম্বা চওড়া এক সেলার তার পাশে দাঁড়িয়ে। মুখে হাসি, হাতে রিভলভার।

আশ্চর্য্য, লোকটা পাশের টেবিলেই এতক্ষণ বসেছিল গোটাকতক বীয়ারের বোতল নিয়ে।

সেলারটা আবার বললে, নিজের পরিচয়টা না দিলে খারাপ দেখায়। আমি একজন ডেপুটি কমিশনার অব পুলিশ।

তারপর কুণালের টেবিল থেকে গোল্ডফ্লেক সিগারেটের প্যাকেট ছেঁড়া সোনালি রিবনের ফাঁস-বাঁধা একটা গোল-রিং কুড়িয়ে নিয়ে শুধু বললে, এসো—

কাচের গেলাসটা কুণালের আড়ষ্ট হাত থেকে পরে চুরমার হয়ে গেল।

★

রায় বেরোল পরদিন। আসামী কুন্তল চ্যাটার্জির বেকসুর খালাসের অর্ডার।

দরজাটা খুলেই রেখেছিল মিতালী। আর নিজে দাঁড়িয়েছিল বারান্দায় কোলের কাছে দীপুকে নিয়ে। যেমন ভঙ্গিতে সেই সাতাশে মাঘের সকালে কুন্তলকে বিদায় দিয়েছিল।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ হল। দরজার কাছে এসে দাঁড়াল কুন্তল আর রমেন। মিতালীর মুখে তখন রোদ-বৃষ্টির খেলা। কুন্তলকে ভেতরে ঠেলে দিয়ে রমেন দরজার কপাট দুটো টেলে দিলে আস্তে আস্তে! তারপর শিস্ দিতে দিতে নেমে গেল।

এখুনি একবার য়্যাটর্নী সেনের অফিসে যেতে হবে। আরো একশো টাকার বিশেষ দরকার এখন।